ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ।। ১৩ পৌষ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

কিশানগঞ্জে বিদ্যার্থী পরিষদের বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলনে দাবি

বাংলাদেশী ভারত ছাড়ো

প্রাণ প্রতিম পাল ঃ কিশানগঞ্জ ।। ছাত্র শক্তি যে রাষ্ট্র শক্তি তা আরও একবার প্রমাণিত হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এ বি ভি পি) মহাসম্মেলনে। গত ১৭ ডিসেম্বর বিহারের কিশানগঞ্জের রুইধাসা ময়দানে বিরাট মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছিল এ বি ভি পি। 'চলো চিকেন নেক' — এই সুরে সুর মিলিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, অরুণাচল থেকে গুজরাট — ভারতের সমস্ত প্রান্তের প্রায় হাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী এই মহাসম্মেলনে যোগ দেয়। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বিতাড়নকে কেন্দ্র করে সরগরম ছিল বিহারের রাজনৈতিকমহল। বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি রামনরেশ সিং-এর মতে এই র‍্যালি একটি প্রচেষ্টা যাতে বিহার ও কিশানগঞ্জের মানুষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হন। পরিষদের সর্বভারতীয় যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক বি সুরেন্দ্রন এবং প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে রঘুনন্দন দু'জনের বক্তব্যেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি প্রতিফলিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে ছাড়েননি পরিষদের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকরও। সারা দেশ যখন সীমান্ত থেকে আসা সন্ত্রাসে জর্জরিত আর তা দেখেও কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। আম্বেকর বলেন যে, বিদ্যার্থী পরিষদ দেশের জনসাধারণ এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই ভয়াবহ পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বিতাড়নের দাবিতে পরিষদ আগামী দিনেও আন্দোলন জারি রাখবে বলে তাঁর ঘোষণা। বিদ্যার্থী পরিষদ নেতৃত্বের হিসেবে তিন কোটি লোক এখনও পর্যন্ত ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে আর এর মধ্যে দেশের শুধু উত্তর-পূর্ব প্রান্তেই প্রায় দেড় কোটি অনুপ্রবেশকারী বসবাস করছে। পরিষদ নেতৃত্ব ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এই বড় সংখ্যায় অনুপ্রবেশকারীরা রয়েছে জেনেও কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন থাকছে এবং সীমান্তে এদের আটকাতে কোনও ব্যবস্থাই করেনি সরকার। তাঁরা আশঙ্কা করছেন যে এর ফলে আগামীদিনে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গভীর সঙ্কটের মুখে পড়তে চলেছে।

কিশানগঞ্জে বিদ্যার্থী পরিষদের বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিরোধী মহাসমাবেশের মঞ্চ।

মহাসমাবেশের একাংশ।

রুইধাসা ময়দানে পরিষদের মহাসম্মেলন শুরু হওয়ার আগে শহরের তিনটি স্থান থেকে তিনটি শোভাযাত্রা (মহার‍্যালি) শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রুইধাসা ময়দানে শেষ হয়। প্রথম শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন এ বি ভি পি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ভাট। যা গো-শালা ময়দান থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয় র‍্যালি স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন এবিভিপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক রামনরেশ সিং। অপর র‍্যালির নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ আন্দোলনের সর্বভারতীয় সংযোজক সুনীল বনসাল। দু'টি র‍্যালি ৩১ নং জাতীয় সড়কে এসে মিলিত হয়। 'বাংলাদেশী গো ব্যাক্'-ধ্বনি ছিল ছাত্র-যুবকদের মুখে। ছাত্রীদের নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল সর্বভারতীয় সম্পাদিকা আশা লাকড়াকে। কিশানগঞ্জ শহরকে বিদ্যার্থী পরিষদের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানারে গৈরিকময় করে তোলা হয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চোখে পড়ছিল 'চিকেন নেক' লেখা বড় বড় হোর্ডিং।

বিদ্যার্থী পরিষদের মহাসম্মেলনকে ঘিরে কিষানগঞ্জে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। গোটা শহরকে নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে দেওয়া হয়। শহরে নামানো হয় র‍্যাফ, এস বি, বি এস এফের ১০৩ কোম্পানীর জওয়ান। এছাড়া প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ ও গোয়েন্দা মোতায়েন ছিল শহরের নানা জায়গায়। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রায় ২০০ জন তীরন্দাজ বাহিনী ২৪ ঘণ্টা সুরক্ষার কাজে শহরের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত ছিল।

রুইধাসা ময়দানে বিদ্যার্থী পরিষদের মহাসম্মেলনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও দেশের সুরক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩০ জন ছাত্র নেতা ও নেত্রী। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার দাবি তোলেন পরিষদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। এবিভিপি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রীনিবাসজী বলেন, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সমস্যা দেশের ক্ষেত্রে

(এরপর ৪ পতায়)

বাংলাদেশে জঙ্গি ঘাঁটি

বাম সরকার নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মাটি ভারত বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহৃত হলে দিল্লী চুপ করে বসে থাকবে না। সংসদের অধিবেশনে সরকার এবং বিরোধী পক্ষ একজোট হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন এন ডি এ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। প্রয়োজনে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে হামলা হলেও বিজেপি যে তা সমর্থন করবে তা সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন তিনি। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে এবার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য যখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত হচ্ছে তখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশ্চর্যজনক ভাবে চুপ। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে ট্রানজিট

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

করিডর হিসাবে ব্যবহার করার ফলে এরাজ্যের দুর্নাম সবচেয়ে বেশি। দেশের যে কোনও প্রান্তে জঙ্গি হামলা হলে পশ্চিম-

(এরপর ৪ পতায়)

ঢুকছে জঙ্গি, ঢুকছে অস্ত্র, পেট্রাপোল খোলা হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সব দলের সাংসদরা যখন এককাট্টা হয়ে সন্ত্রাসবাদকে শায়েস্তা করার জন্যে কঠোরতম আইন তৈরি করছে তখন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে অবাধে পণ্যবাহী ট্রাক, টাটা সুমো, কোয়ালিস গাড়ি প্রতিদিন বাংলাদেশে যাতায়াত করছে। এসব গাড়িগুলোর কার্যত কোনওরকম 'চেক আপ'ই হচ্ছে না। এই সুযোগে বাংলাদেশী মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা অবাধে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। একেই বলে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। তবে এক্ষেত্রে বজ্র আঁটুনি তো দূরের কথা — দরজা যেন হাট করে খোলা।

শুনলে একটু আশ্চর্য লাগবে যে পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে পারাপারের সময় কোনও রকম চেক আপই হয় না। যদিও এখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আউট পোস্ট (বি এস এফ ক্যাম্প), কাস্টমস্ এবং অভিবাসন চেক পোস্ট রয়েছে। তাদেরই লাগোয়া যাতায়াতকারী মানুষজন, যানবাহনের উপর নজরদারি, বৈধ অনুমতিপত্র এবং মালপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা।

সরকারি স্বীকৃতিহীন পরিচয়পত্র

পেট্রাপোল থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে পরবর্তী বড় ক্যাম্প একটু ভিতর দিকে — যশোর রোডে, বেনাপোলে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ২০০০ বৈধ পাসপোর্ট ভিসাধারী এবং নিদেনপক্ষে ৬০০ মালপত্র বোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যায়। এদের যাতায়াত সহজ করার জন্য দিবারাত্র কাজ করছে ৭০০ জন ক্লীয়ারিং এজেন্ট এবং দালাল। ওই সব ক্লিয়ারিং এজেন্টদের আবার কোনও সরকার কর্তৃক বিধিবৎ নিযুক্ত করা হয়নি। তারা সবাই স্থানীয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বেসরকারি ও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট এজেন্ট ও দালালদের এক ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন রয়েছে। তারাই পরিচয়পত্র ইস্যু করা থেকে যাবতীয় দেখভাল করে। ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন তার সদস্যদের পঞ্জিকরণ থেকে নবীকরণ করা—সবই করে। অবাক করার মতো বিষয় হল, ওই পরিচয় পত্র দিয়েই এপার-ওপার যাতায়াত চলে। যারা এই সিন্ডিকেটের মাতব্বর তাদেরও কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের পরিচয়পত্র দেখালে সহজেই পাওয়া যায় মোবাইলের

(এরপর ৪ পতায়)

গো-গ্রাম যাত্রা নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

গো-রক্ষা হলেই দেশ ও পরিবেশ দূষণ মুক্ত হবে

গো-গ্রাম প্রশিক্ষণ শিবিরে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীরামেশ্বর ভারতী মহারাজ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গ্রামের উন্নয়ণ হলেই ভারতের উন্নয়ন হবে। ভারত গ্রামে বাস করে, গ্রামের ভিত্তি কৃষি এবং কৃষির সহায়ক হল গরু। গোরক্ষা হলেই দেশ রক্ষা পাবে এবং পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। দু'দিন ব্যাপী গো-গ্রাম যাত্রা প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারাম কেদিলাই। তিনি আরও বলেন, গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ শহরে আসছে নানা কারণে। এখন সময় এসেছে গ্রামকে রক্ষা করতে হবে, গ্রামের আর্থিক সুরক্ষা এবং পরিবেশকে রক্ষা করা একান্ত দরকার। এজন্য এখন শহর থেকে গ্রামে যেতে হবে। গ্রামকে স্বনির্ভর ও আর্থিক স্বাবলম্বনের জন্য গো-রক্ষা আবশ্যিক। গ্রামে এই বার্তা পৌঁছে দিতেই বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা ২০০৯-১০-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একাজে নেতৃত্ব এবং মার্গদর্শন করতে এগিয়ে এসেছেন দেশের প্রমুখ সাধু-সন্তবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যোগগুরু রামদেবজী, আর্ট অফ্ লিভিং খ্যাত সন্ত রবিশংকরজী মহারাজ, পূজ্য আচার্য মহাপ্রজ্ঞজী (তেরাপন্থ), আচার্য বিদ্যাসাগরজী (দিগম্বর পন্থ), আচার্য বিজয় রত্ন সুন্দর সুরেশ্বরজী (মন্দিরমার্গ), পূজ্য মাতা অমৃতানন্দময়ী ও গায়ত্রী পরিবারের প্রমুখ প্রণব পান্ড্যাজী।

কর্মশালার শেষে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন রামেশ্বর ভারতীজী এবং তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন।

তিনি বলেন, গোরক্ষা এবং পঞ্চ গব্য থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। এর ফলে সাত্ত্বিক বিচার (শুভ চিন্তাভাবনা) এবং সুসংস্কার নির্মাণ হবে। স্বরাজ এবং সুরাজের জন্য গরু, গ্রাম এবং প্রকৃতির কাছে যেতে হবে। ভারতবর্ষের সকল মত-পথের সাধু-সন্তদের নেতৃত্বে এবং মার্গদর্শনে আগামী ২০০৯-এ ১০৮ দিন ব্যাপী বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রায় এক বছর আগে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। চলছে সন্ত সম্মেলন, কর্মী প্রশিক্ষণ, নাগরিক বৈঠক। গত ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে এজন্য দু'দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালাতে পথনির্দেশ করেন দক্ষিণ ভারতের গোকর্ম পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য শ্রীরামেশ্বর ভারতী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারাম কেদিলাই এবং এই যাত্রার সর্বভারতীয় সংযোজক শঙ্করলাল আগরওয়াল এবং নাগপুর থেকে আগত অখিল ভারতীয় গো-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সঞ্চালক সুনীল মানসিংকা।

মাদ্রাসা প্রেম

যখন কমপিউটার এরাজ্যে আনার ভাবনা-চিন্তা চলছিল, তখন প্রথম বিরোধিতাটাই ছিল বামেদের। কিন্তু এখন বাম সরকারই চাইছে কমপিউটার শিক্ষার প্রচার হোক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কমপিউটার শিক্ষার বিস্তার চাইছে রাজ্য সরকার।

সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী আবদ্দুস সত্তার এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। ১০০টি মাধ্যমিক মাদ্রাসায় কমপিউটারের ওপর জোর দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখে সংখ্যালঘুদের জন্য এই দরদের পিছনে অনেকেই ভোটের গন্ধ পাচ্ছেন।

জবরদখলকারীরা বাংলাদেশী

অসমে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধ ।।গত কয়েক মাস ধরেই অসম সরকারের এক কংগ্রেসী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সে রাজ্যের বনাঞ্চলে বাংলাদেশী মুসলমানদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। এখন কেন্দ্র সরকারের প্রকাশিত রিপোর্টে সেই অভিযোগই প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তরের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, অসমের সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর বনভূমি অবৈধভাবে জবরদখল করা হয়েছে। জবরদখল জমির এই পরিমাণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। সংবাদের ভাষায় নেতিবাচক অগ্রগতি (Negative Achievements)।

এই হিসাব অবশ্য ২০০৮-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ওদিকে লাগোয়া মেঘালয় রাজ্যে এরকম দখলীকৃত সরকারি বনভূমির পরিমাণ হল ৯,৩১২ হেক্টর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দুটি রাজ্যই বাংলাদেশ লাগোয়া এবং ওই দুই রাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বসতি গড়ার অভিযোগ তিন দশকের পুরনো। অসমের বন ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব বি বি হাগজ এজন্য ২০০৫ সালের উপজাতি ও পরম্পরাগত বসবাসকারী আইন কে-ই দায়ী করেন। তিনি আরও বলেছেন, "আমরা তিনসুকিয়া, ডিব্রু-সাইখোয়া, গুয়াহাটির বোথাগুলি থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছি। ওখানে উপজাতি ছাড়া অন্যরা বনভূমি জবরদখল করেছে। তাদের বক্তব্য তারা ওখানে তিনপুরুষ (৭৫ বছর) ধরে বসবাস করছে, যাতে তাদের উচ্ছেদ না হতে হয়।" এখানে উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব রহমান প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের বাড়তি জনসংখ্যার জন্য পড়ে রয়েছে অসম (উত্তরপূর্বের সাতটি প্রদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূভাগ। শেখ মুজিবের কথার মর্ম এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে।

তবে বিশ্বস্ত সূত্র মতে— বনাঞ্চলে জবরদখলকারীদের বেশির ভাগই বাংলাদেশী এবং উচ্ছেদ না হওয়ার পক্ষে মূল বাধা স্থানীয় এম এল এ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়করা উচ্ছেদ অভিযানে মোটেই উৎসাহী নন এবং কোনওরকম ঝুট ঝামেলায় যেতে রাজী নন। এমন কী উচ্ছেদ অভিযান হলে তারা জবরদখলকারীদেরকে সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে উসকানি দেন। দেখা গিয়েছে জবরদখলকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন ফরেস্ট অফিসাররা। ফরেস্ট অফিসারদের ক্যাম্পে আগুন লাগানোও হয়েছে।

২০০২-২০০৩ সালে এরকম দখলদার উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন একজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল জবরদখলকারীরা। এখন সরকার বনবিভাগকে শুধুমাত্র এলাকা চিহ্নিত করতে বলেছে। অন্যদিকে উচ্ছেদ অভিযানই বন্ধ হয়ে গেছে।

২০০৯ সালকে গো-সম্পদ সচেতন বর্ষ হিসাবে পালনের ডাক মুসলিমদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ ২০০৯ সালকে 'গো সম্পদ সচেতন বর্ষ' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সংযোজক গিরীশ যুগল ও সভাপতি তনবীর এই ঘোষণা করেছেন। মঞ্চ ২২টি রাজ্যের ২৪০টিরও বেশি জেলায় এই অভিযান চালাবে। অভিযানে তারা সাধারণ মানুষকে গো ও গো-সম্পদের বিষয়ে সচেতন করবে বলেও জানা গেছে। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসাবে, চলতি বছরেও তারা গো-সংরক্ষণ ও গো-রক্ষা দাবিতে মুসলিমদের গণ হস্তাক্ষর সহ একগুচ্ছ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

পাত্রী চাই

পাত্রনদীয়া নিবাসী, মাহিষ্য, বয়স ২৬, উচ্চতা ৫'-৬" বি এ (2nd), প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী পরিবার। মাধ্যমিক সমতুল্য উপযুক্ত পাত্রী চাই।

যোগাযোগ - ৯৯৩২২৭৭২৬৮

গহনা যদি গড়াতে চান যে কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয় !

অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নতুন আইনেও ভোট ব্যাঙ্কের গন্ধ

কংগ্রেসী রাজনীতিকরা নিজেদের রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্যাতন করিবার জন্য ‘মিসা’ আইন প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে নাই। এখন তাহারাই শুধু ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য কঠোর আইন তৈরি করিতে রাজি নয়। জরুরী অবস্থার সময় কোনও কারণ ছাড়াই সারা দেশে এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাত্রিতে যেসকল খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তা বিরোধী কাজকর্মের কথা তো দূরে থাকুক, সাধারণ কোনও অপরাধেও দোষী ছিলেন না। মোরারজী ভাই দেশাই এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর মতো মানুষকেও কারাগারে পাঠানো হইয়াছিল।

অ্যাটর্নি জেনারেল সুপ্রীম কোর্টে বলিয়াছিলেন, জরুরী অবস্থার সময় এমনকী বাঁচিবার মতো মৌলিক অধিকারও বাতিল করা হইয়াছিল। এখন সেই কংগ্রেস দলই এক সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলিমদের) চাপে পড়িয়া টাডা, এন এস এ এবং এই ধরনের আইনগুলি অকেজো করিয়া ফেলিয়াছে। মুসলিমদের সহানুভূতি পাইবার জন্য কংগ্রেস টাডা আইনটি বাতিল করিয়াছে, কেননা এই আইনে গ্রেপ্তার হওয়া বেশিরভাগ বন্দীই ছিল মুসলিম।

সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিবার জন্য এন ডি এ সরকারের আমলে ‘পোটা’-র মতো কঠোরতম আইন তৈরি করা হইয়াছিল। কিন্তু এই আইনকে বাতিল করিবার জন্য বহু মুসলিম গোষ্ঠী চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়। ইউপিএ ঘোষণা করিয়াছিল ক্ষমতা লাভ করিলে তাহারা প্রথমেই পোটা আইন বাতিল করিয়া দিবে। তাহারা সোচ্চারে আরও ঘোষণা করিয়াছিল যে পোটা হইতেছে মুসলিম বিরোধী আইন। তাই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা নয় — মুসলিম তোষণের জন্যই ‘পোটা’ আইনটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। কিন্তু তথাকথিত কিছু মুসলিম শুভানুধ্যায়ী সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় ও মদত দিয়া থাকে এবং তাহাদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মের ফলে পুরো মুসলিম সমাজই আত্মপরিচয়ের (আগে ভারতীয় না মুসলিম) সংকটে পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের হইলেও সত্য, ইউপিএ সরকার মুসলিমদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে — সংখ্যালঘু হিসাবে তাহাদের পৃথক অস্তিত্বকে বজায় রাখিতেই মদত দিয়া চলিতেছে।

পোটা আইন বাতিল ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে সবুজ সংকেত-এর কাজ করিয়াছিল। সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়া যায় এবং শত শত নিরীহ মানুষের রক্তে ভারতের মাটি ভিজিয়া উঠে। গত ২৬ নভেম্বর মুম্বাই-এর হামলায় তাহা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তাজ হোটেলে জঙ্গিদের মোকাবিলার সেই ষাট ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য টিভি-র পর্দায় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। বস্তুত পোটা যেদিন হইতে বাতিল করা হইয়াছিল, তখন হইতেই সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার জন্য একটি কঠোর আইন তৈরি লইয়াও সমান্তরাল বিতর্ক শুরু হইয়া যায়। এমনকী ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এম কে নারায়ণন সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তা লইয়া নিজের অভিমত প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও তাহার শরিক দলগুলি পোটা বাতিল করিয়া অর্জিত রাজনৈতিক ফায়দাকে বিসর্জন দিতে রাজি হয় নাই।

মুম্বাই-এর সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার সন্ত্রাস বিরোধী কঠোর আইন তৈরি করিতে বাধ্য হয়। কেননা ইহা না করিলে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কংগ্রেস ও তাহার শরিকদলগুলি এই মর্মে কিছুই করে নাই — এই বার্তাই যাইবে। তাই শাসনকালের শেষ পর্বে ইউপিএ সরকার সন্ত্রাস বিরোধী আইন তৈরি করিয়াছে বটে, কিন্তু ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির গন্ধ তাহা হইতে যায় নাই।

সন্ত্রাস দমনে নতুন ‘আন ল ফুল এক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল’ (ইউ এ পি এ)-এ বাহ্যত কয়েকটি কঠোর ধারা যুক্ত হইয়াছে। আগে এই আইনে একটি ধারায় ছিল যে তদন্তকারী প্রবীণ অফিসারদের কাছে সন্ত্রাসবাদীদের স্বীকারোক্তি আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রের সম্মুখে স্বীকারোক্তি আদালতে গৃহীত হইবে। মন্দের ভালো, এই ধারাটিকে সংশোধিত করিয়া পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিও আদালত গ্রাহ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু সন্ত্রাস দমনে দুইটি আইন — ‘ন্যাশন্যাল ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সি (এন আই এ) এবং ইউ পি এ পি এ কার্যত সন্ত্রাসের মোকাবিলায় যথেষ্ট নহে। সন্ত্রাস দমনে আমাদের দেশের আইনগুলি আমেরিকা, বৃটিশ ও অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় কঠোর নয়। পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে যতটা ক্ষমতা দেওয়া দরকার ততটা দেওয়া হয় নাই। টেলিফোন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রাপ্ত সাক্ষ্য ইত্যাদিকে আইনত বৈধ হিসাবে গণ্য করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হয় নাই। বলিতে পারা যায়, এই নতুন আইনেও ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির গন্ধ যায় নাই। অন্যান্য দেশের সন্ত্রাস দমনের আইনের তুলনায় এই আইনটি নখদন্তহীন।

প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের তদন্তকারী সংস্থা ও পুলিশকে কেন এইসব ক্ষমতা হইতে বঞ্চি ত করা হইতেছে? যদি আমরা সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকরভাবে মোকাবিলা করিতে চাই, তাহা হইলে এই দ্বিধা কেন? শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকাইয়া নয়, জাতীয় স্বার্থেই এই আইনের যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্যোসাল সিকিউরিটি ফর আন-অর্গানাইজড বিল, ২০০৭

নেপথ্যের কিছু বৃত্তান্ত

এন সি দে

অবশেষে গত ১৭ ডিসেম্বর'০৮ লোকসভাতেও পাশ হয়ে গেল “সোসাল সিকিউরিটি ফর আন-অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স বিল, ২০০৭।” গত অধিবেশনে তাড়াহুড়ো করে রাজ্যসভাতেও কোনও আলোচনা ছাড়াই এই বিল পাশ হয়ে গিয়েছিল, বামপন্থী দলীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাংসদ থাকা সত্ত্বেও সংসদে এই নিয়ে কোনও বাদানুবাদ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বামপন্থী সাংসদগণ সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইন পাশের বিরুদ্ধে শুধু সোচ্চার হয়েছিল। কেননা এতে ওদের লাভ বেশি। সব মুসলমানরা সন্ত্রাসবাদী নয়, এটা যেমন সত্যি, সব সন্ত্রাসবাদীরাই যে মুসলমান এটাও সমান সত্যি—এ সত্য বামপন্থীরা ভাল করেই জানে। তাই কড়া আইনের অপব্যবহারের তত্ত্ব তুলে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার জন্য কড়া আইনের প্রয়োজনের বিরোধিতা করলে তা যে মুসলমানদের খুশি করবে তা স্বাভাবিক।

বি এম এস তো একটি অরাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠন। সংসদে তার কোনও সাংসদ নেই। তাই সংসদে তার হয়ে প্রশ্ন তোলারও কেউ নেই। শ্রমিকদের প্রতি বি জে পি'র কোনও দায়বদ্ধতা নেই; তাই তারাও কোনও প্রশ্ন তোলে না। এরা যে ভোটার বি জে পি হয়তো তা জানে না।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা অর্থাৎ পেনশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য এই বিলের পরিকল্পনা কিন্তু বি জে পি-নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের। কিন্তু ‘ভারত উদয়ের’ সোনার পাথর বাটির তথ্য নিয়ে তারা এত ব্যস্ত ছিল যে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তা করার সময় পায়নি। পাথর বাটিও যে ভেঙ্গে যেতে পারে তা তারা ভেবে দেখেনি। তাই এন ডি এ সরকার ভেঙ্গে গিয়ে কংগ্রেসী নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার এল। ২০০৪ থেকে অনেক টালবাহানার পর ২০০৭-এ তৈরি হল Unorganised Sector Workers Social Security Bill, 2007 । তারপর থেকে শুধুই আলোচনার প্রতীক্ষা। নানান অজুহাতে তা পিছিয়ে দেওয়া। গত শীতকালীন অধিবেশনে নভেম্বর, ২০০৭-এ রাজ্যসভায় আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েও আলোচনা হয়নি। শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেস সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ স্বাভাবিকভাবেই উঠেছিল।

এরপর ২০০৮-এর ২৮ এপ্রিল ও ৫ মে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেন যে ভারত সরকার এই বিলের কোনও বিধান নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি ও স্ট্যাণ্ডিং কমিটি অন লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্টের চেয়ারম্যানের কোনও প্রস্তাব বিবেচনা করবে না। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর যে অ্যাডভাইসারি বোর্ড গঠন করা হবে তার কাছে প্রস্তাবগুলি পেশ করা যেতে পারে। মন্ত্রীকে তখন বোঝানো হয় যে সরকার প্রস্তাবিত এই বোর্ড তো কেবলমাত্র অ্যাডভাইসারি। স্বাভাবিকভাবেই এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই। প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা বা নাকচ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র সরকারের হাতে। এখন শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রস্তাব যদি সরকার নাকচ করে দেয়, তাহলে এই আইন তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হারিয়ে ফেলবে।

এই বছরই ১৯ আগস্ট শ্রমমন্ত্রী আবার কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন এবং জানিয়ে দেন যে প্রস্তাবিত বিলটি মন্ত্রীমন্ডলীর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি এও জানান যে শ্রমিক সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই এই বিলে ঢোকানো হয়েছে। আরও জানানো হয় যে ক্যাবিনেট

> “ এই বিলে তো EPF, ESI বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের কোনও বিধান নেই, নিযুক্তি সংক্রান্ত কোনও শর্তও নেই, তাহলে তো এই সরকারি প্রকল্পের অধীন শ্রমিক কর্মচারীদেরও অসংগঠিত শ্রমিক বলে চালাতে চাইছে সরকার। শ্রমিক সুরক্ষা সুবিধাদির বাইরে করে দিতে চাইছে এই বিশাল শ্রমিক কর্মচারীদের। ”

এই সংশোধিত বিলটি ২০০৮'-এর ২২ আগস্ট অনুমোদন করেছে। কিন্তু বিলটি শ্রমিক সংগঠনগুলিকে দেখানো হয়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিলের নামটিই বদলে দেওয়া হয়েছে। নতুন আইনটির নামকরণ করা হয়েছে Social Security for Unorganised Workers Bill, 2007। মূল বিলটি ছিল Social Security for Unorganised Sector Worker Bill অর্থাৎ নতুন বিলটি থেকে “Sector” কথাটি শুধু বাদ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ চোখে দেখলে ব্যাপারটি খুবই নগণ্য কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে ওই একটি কথার গুরুত্ব কত ব্যাপক। আসুন ওই কথাটির গুরুত্ব নিয়ে একটু আলোচনা করি। অসংগঠিত ক্ষেত্র (Unorganised Sector) বলতে সেইসব ক্ষেত্রকে বোঝায় যেসব ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ শ্রমিক নিজেই নিজের নিয়োগকর্তা এবং যারা কোনও শ্রম আইনের বা শ্রমিক সুরক্ষা আইনের (EPF, ESI ইত্যাদি) আওতায় আসে না। আর সংগঠিত ক্ষেত্র বলতে সেইসব ক্ষেত্রকে বোঝায় যেখানে শ্রমিক-মালিক সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, নির্দিষ্ট উৎপাদনের কাজে যুক্ত আছে।

এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা মালিক কর্তৃক কর্মে নিযুক্ত এবং নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে তারা কাজ করে। বিভিন্ন শ্রম আইনের এবং শ্রমিক কল্যাণ/সুরক্ষার আইনের তারা অধীন।

এই বিলে বা আইনে এই ‘ক্ষেত্র’ বা ‘Sector টিকে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা বা কোন্ অসংগঠিত শ্রমিকরা এই আইনের আওতায় আসবে তা নিয়ে বিতর্ক উঠবেই। শোনা যাচ্ছে, সরকার চাইছে শুধু Unorganised Sector-এর শ্রমিকরাই নয়, Organised Sector-এর Unorganised শ্রমিকরাও এই আইনের সুবিধা ভোগ করুক। সরকারের আসল উদ্দেশ্য ঢট্রড্ডত্র — অঙ্গনবাড়ির মতো বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদেরও এই আইনের অধীনে নিয়ে আসা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার চালিত বিভিন্ন প্রকল্পে যারা নিযুক্ত রয়েছে তারা তো ভলান্টিয়ার, ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাক্ট, টেম্পোরারি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তাই এরা বর্তমান বিভিন্ন শ্রম আইনের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কারণ, এদের পরিচিতি আছে, নিয়োগকর্তাও আছে। কিন্তু এই বিলে তো ড্রত্নণ্ঠ, ড্রত্রঢ বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের কোনও বিধান নেই, নিযুক্তি সংক্রান্ত কোনও শর্তও নেই, তাহলে তো এই সরকারি প্রকল্পের অধীন শ্রমিক কর্মচারীদেরও অসংগঠিত শ্রমিক বলে চালাতে চাইছে সরকার। শ্রমিক সুরক্ষা সুবিধাদির বাইরে করে দিতে চাইছে এই বিশাল শ্রমিক কর্মচারীদের।

সমাজের উপেক্ষিত অংশের মানুষকে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির দায়িত্ব সরকারের। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই এইসব প্রকল্প গঠন করা হয়। এইসব প্রকল্পের কর্মচারীদের নিয়োগ কর্তা যেহেতু সরকার, তাই এদের অসংগঠিত শ্রমিক বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই বিলে কোনও কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও নেই, ফান্ডের কথাও নেই।

এখনও এই বিল বা আইনের অনেক কিছুই পরিষ্কার নয়, যেমন কারা কারা সুবিধা পাবে, তাদের আইডেন্টিটি কার্ড কে, কীভাবে দেবে, রেকর্ড কে বা কারা রাখবে ইত্যাদি। ভারতীয় মজদুর সংঘ আগেভাগেই দাবি জানিয়ে রেখেছে যেন এইসব দায়িত্ব রাজ্য সরকার এবং পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া না হয়। এই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য EPFO এবং ESIC'-র মতো স্বাধীন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবিও তারা জানিয়ে রেখেছে। স্বাস্থ্য-বীমা, পরিবার ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ এবং কল্যাণমূলক স্কীমের এবং গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের জন্য পৃথক পৃথক আইন তৈরির প্রয়োজনের কথাও বি এম এস সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

পাকিস্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন আন্তুলে
মুসলিম ভোটের ভয়ে বরখাস্তে দ্বিধা কংগ্রেসের

গূঢ়পুরুষ ।। আবদুর রহমান আন্তুলে সম্প্রতি মুম্বাইয়ে পাক জঙ্গি হামলায় হেমন্ত কারকারে ও তাঁর সহকর্মী আরও দু'জন পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর ঘটনার পিছনে "হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের" হাত থাকার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত "হিন্দু জঙ্গিদের" আড়াল করতেই হেমন্ত কারকারে ও তাঁর দুই সহকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আন্তুলে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আন্তুলের বক্তব্য সরকারি বক্তব্য। এমনকী কংগ্রেস দলেরও বক্তব্য। কারণ, এ আই সি সি -র সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিংহও আন্তুলের বক্তব্যের সাফাই দিয়েছেন এই কথা বলে যে তিনি হেমন্ত কারকারের "হত্যা রহস্যের" তদন্ত চেয়েছেন। এই দাবির মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। চমৎকার যুক্তি। আন্তুলে এবং তাঁর দোসর সিংহ সাহেব ভালভাবেই জানেন যে মুম্বাইয়ের জঙ্গি হামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। এই তদন্তে ভারতীয় গোয়েন্দাদের সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা দিচ্ছে ইন্টারপোল এবং এফ বি আই। বিগত ছয় দশকে আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ স্তরে এমন ব্যাপক তদন্ত ভারতে আর হয়নি। তারপরেও আন্তুলে সাহেব তদন্ত চাইছেন। কেন? এর উত্তর, মুসলিম ভোট চাই। আন্তুলে ভুলে যাচ্ছেন যে মুসলিম ভোটের থেকেও অনেক বড় দেশ ও দেশের সম্মান। এমন দেশ বিরোধী কথাবার্তা বলে তিনি পাকিস্তানের হাতে অপ-প্রচারের অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ফলাও করে ভারতের এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতি প্রচার করেছে। বলা হয়েছে, আন্তুলে ভারতের বিপন্ন মুসলিম সমাজের ত্রাণকর্তা। ইসলামের একজন প্রকৃত যোদ্ধা। আন্তুলে তাঁর বক্তব্যে অনড় থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড মুসলিম ভোট হারাবার ভয়ে আন্তুলের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত।

মুম্বাইয়ের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের প্রধান হেমন্ত কারকারের হত্যার ঘটনাকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর যে অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চলছে তার পিছনে বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী উর্দু সংবাদপত্রের যোগসাজস আছে। মুম্বাইয়ের তিনটি উর্দু খবরের কাগজ জঙ্গি হামলার শুরু থেকেই প্রচার শুরু করেছিল যে এই জঙ্গিরা আদতে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু আজমল কাসভ নামে একজন পাক সন্ত্রাসবাদী জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার হওয়ার পর উর্দু প্রেসের প্রচারের বেলুন ফেঁসে যায়। তবুও আন্তুলের মতো কট্টর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের মুখ বন্ধ হয়নি। আন্তুলের সাম্প্রদায়িক বক্তব্যে বিরক্ত হয়ে মুম্বাইয়ের প্রাক্তন চলচ্চিত্র নায়িকা সিমি গ্রেওয়াল মন্তব্য করেছেন, "সুযোগ থাকলে মুম্বাইয়ের প্রতিটি মুসলমান পরিবারের বাড়ির ছাদে পাকিস্তানের পতাকা উড়তো।"

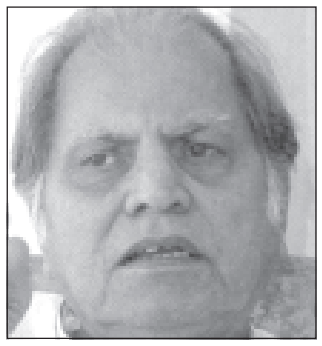

এ আর আন্তুলে

বোঝাই যায় যে একজন মুসলিম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তায় প্ররোচিত হয়েই সিমি গ্রেওয়াল এমন ক্রুদ্ধ মন্তব্য করেছেন। সন্দেহ নেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকরা এইভাবেই জাতি দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয়।

আন্তুলের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনামূলক বিবৃতি নতুন কোনও কথা নয়। গত ২০০৬ সালের জুলাই মাসে মুম্বাইয়ের লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মিটিংয়েও আন্তুলে এই বিস্ফোরণের দায় আর এস এসের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিভাগের মন্ত্রী অর্জুন সিংহ আন্তুলেকে সমর্থন করেছিলেন। আন্তুলের বক্তব্য, আর এস এস এবং বজরঙ্গ দলের সমর্থকরা ভারত থেকে মুসলিমদের উৎখাত করতে মুসলিম জঙ্গির ছদ্মবেশে হামলা চালাচ্ছে। সেই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আন্তুলে অভিযোগ করেছিলেন যে ২০০৬ সালের ৪-৫ এপ্রিলের গভীর রাত্রে মহারাষ্ট্রের নানদেড়-এ স্থানীয় আর এস এস নেতা লক্ষ্মণ রাজকোণ্ডয়ারের বাসভবনে যে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার পিছনেও আর এস এস এবং বজরং দলের হাত ছিল। এই বিস্ফোরণে লক্ষ্মণ রাজকোণ্ডয়ারের পুত্র নরেশ এবং তাঁর আত্মীয় হিমাংশু ফানসে নিহত হন। আন্তুলে দাবি করেছিলেন যে নরেশ এবং হিমাংশু আদতে বজরং দলের আত্মঘাতী জঙ্গি। নিজেদের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে বিস্ফোরণ ও হত্যার দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। এরপরেও এই উগ্র সাম্প্রদায়িক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়নি।

কারণ, মুসলিম ভোট চাই। আন্তুলে এই মুসলিম সাম্প্রদায়িক তাস দেখিয়েই ১৯৮০ সালে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মুম্বাইয়ের অন্ধকার জগতের কুখ্যাত ডন হাজি মস্তানের সঙ্গে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার দুই বছরের মধ্যেই মুম্বাইয়ের বিল্ডিং প্রমোটারদের কাছ থেকে জোর করে তোলা আদায়ের অভিযোগ মুম্বাই হাইকোর্ট আন্তুলেকে অপরাধী ঘোষণা করে। আন্তুলে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের অজান্তে "ইন্দিরা প্রতিভা প্রতিষ্ঠান" নিজের নামে গঠন করে প্রমোটারদের কাছ থেকে কয়েক শত কোটি টাকা তোলা আদায় করেছিল। শর্ত ছিল মুখ্যমন্ত্রী আন্তুলের ট্রাস্টে চাঁদা না দিলে সিমেন্টের সরকারি পারমিট পাওয়া যাবে না।

সেসময় হাইকোর্টের রায়ের পর আন্তুলেকে বরখাস্ত করতে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে জঙ্গি ঘাঁটি

(১ পাতার পর)

বঙ্গের নাম জুড়ে যাচ্ছে। এমনকী মুম্বই হামলার মতো জঘন্যতম কান্ডেও মোবাইলের সিমকার্ড কেনা হয়েছিল কলকাতার আশপাশ থেকে। তবুও পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার চুপ। বাংলাদেশ লাগোয়া প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে অহরহ অনুপ্রবেশ নিয়ে সিপিএম চুপ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী বারবার রাজ্যকে অনুপ্রবেশ নিয়ে সতর্ক করেছে। তবুও সিপিএম সরকারের হেলদোল নেই। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য এই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। অথচ রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এখনও হিসাব নেই রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত। রাজ্য গোয়েন্দা কর্তারা বলেছেন, সরকার আমাদের কাছে এমন হিসাব কখনও চায়নি। ফলে সীমান্তের জেলাগুলি থেকে তা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিনি। শুধু অনুপ্রবেশ নয়, সীমান্ত দিয়ে অবাধে চোরাচালান, চাল, সার, লবণ পাচার নিয়েও বামফ্রন্ট সরকারের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। দিল্লিকে বাংলাদেশ নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিস্ফোরক তথ্য দিতে পারে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু পরপর জঙ্গি হানার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যটির নেতাদের ভূমিকা রীতিমতো বিস্ময়ের। দিল্লীকে এখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ভরসাতেই থাকতে হয়। সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম রাজ্যকে একথা বলে গিয়েছেন।

রাজ্যের গোয়েন্দারা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার সব কিছুই ভোটের আয়নায় দেখে। সমস্যা তাতেই।

বাংলাদেশী ভারত ছাড়ো

(১ পাতার পর)

একটা বড় সমস্যা। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য নেতারা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করছে না। ভারত থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের রেশন কার্ড এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কথা বিভিন্ন বক্তারা তাদের ভাষণের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন।

বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ভাট বলেন, কোনও রাজনৈতিক দল, কোনও রাজনৈতিক নেতা ভারতমাতাকে বিক্রি অথবা দেশের অখন্ডতাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে, তবে তার পরিণাম ভয়াবহ হবে বলে তিনি জানান। এই একই বিষয়ে সমগ্র ভারতের ছাত্র যুব সমাজ রুইধাসা ময়দানে ওই দিন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বিতাড়নের সংকল্প গ্রহণ করে। রাজ্য বিজেপি নেতা এবং কাউন্সিল সদস্য রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে তথ্য পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন, 'সংযুক্ত বিহারে শুধুমাত্র কিষানগঞ্জ নয়, সব মিলিয়ে মোট ১৪টি জেলায় বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ বসবাস করত।' এখন বিভক্ত বিহারেও মোট ৮টি জেলা কিশানগঞ্জের মতোই অনুপ্রবেশ সমস্যা কবলিত রয়েছে বলে তাঁর দাবি। তাঁর আরও দাবি, বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র জনবিন্যাসেই পরিবর্তন ঘটাবে না; স্থানীয় জনগণের মধ্যে চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের চাকরির বাজারকেও বিশালভাবে প্রভাবিত করবে। একটি চাঞ্চল্যকর তথ্যের উপস্থাপনা করে শ্রীগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশ নিজেই তার সেন্সাস রিপোর্টে স্বীকার করে নিয়েছে মৃত্যু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনও কারণ ছাড়াই সে দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি কমে গিয়েছে। তাঁর দাবি, সেই ১ কোটি বাংলাদেশীই বিহারের বিভিন্ন সীমান্ত যেমন কিশানগঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের সহ-সম্পাদিকা পারুল মন্ডল বলেন, বাংলাদেশ ভারতের কাছে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে। ভারতের এই পুণ্যভূমি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নয় বলে তিনি স্পষ্ট করেন। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (দিল্লী)-এর ছাত্র নেতা মহম্মদ শামিম বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষণ দেন। রুইধাসা ময়দানে মহাসম্মেলন চলাকালীন সঙ্ঘ পরিবারের বেশ কয়েক জন পদাধিকারী কার্যকর্তাকে দর্শকাসনে দেখা গিয়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক রামনরেশ সিং-এর নেতৃত্বে ছাত্র নেতাদের এক প্রতিনিধি দল অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে ৫ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসক ফেরাক আহমেদের হাতে তুলে দেন। স্মারকলিপির প্রতিলিপি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে পরিষদ সূত্রে জানান হয়েছে।

রহস্যজনকভাবে কিশানগঞ্জের সরকারি আধিকারিকরা কিন্তু এই জ্বলন্ত সমস্যার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। পূর্ণিয়ার ডি আই জি, এস কে ঝা বলেছেন, 'যদ্দুর জানা গিয়েছে কিশানগঞ্জে কোনও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ হয়নি।' একই বক্তব্য কিশানগঞ্জের পুলিশ সুপার এম আর নায়কেরও। তাঁরও নাকি কোনও অবৈধ বাংলাদেশী বসবাসকারী চোখে পড়েনি।

'চিকেন নেক'কে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করারও দাবি করা হয়। হাড় হিম্ করা ঠান্ডায় গোটা কিশানগঞ্জের আকাশে-বাতাসে একটাই ধ্বনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-যুব সমাজের মুখে শোনা গিয়েছিল—"চিকেন নেক লেকর কিশনগঞ্জ তুম লড়তে রহো, পুরা ভারত তুমহারা সাথ হ্যায়"। যা সত্যিই রোমাঞ্চ কর।

পেট্রাপোল খোলা হাট

(১ পাতার পর)

সিম কার্ড যা টেলিফোন কোম্পানীগুলো দিয়ে থাকে।

এদিক থেকে বাংলাদেশগামী মালপত্র ভর্তি লরি বা ওপার থেকে আসা ট্রাকগুলোর চেকিং হয় শুধু নামমাত্র—লোক দেখানো গোছের। এই চেকিং-এর দায়িত্ব সরকারি কাস্টমস্ বিভাগের। তারা যে কোনও সন্দেহভাজন বস্তু দেখলেই সেই গাড়ির পারাপার বন্ধ করে দিতে পারে। যদি কালে ভদ্রে কাস্টমস্ কখনও কড়াকড়ি করে তখনই দালালরা গাড়ি দিয়ে জ্যাম লাগিয়ে রপ্তানিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে। এই সব আমদানি রপ্তানির কাজে নিযুক্ত গাড়িগুলোর চালক বা খালাসিদেরও কোনও পরিচয়পত্র বা লাইসেন্স পরীক্ষা করা হয় না। রেকর্ড রাখা তো দূরের কথা।

এখানে সীমান্ত এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি কেন্দ্র আছে সেখানে সাদা কাগজে ড্রাইভারদের লাইসেন্স নম্বরটাই কেবল লিখে রাখা হয়। আর ক্লিনার বা খালাসীদের কোনও রকম খোঁজখবর রাখাই হয় না। ওই ক্লিনারদের ছদ্মবেশে কোনও ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী যাতায়াত করে তাহলেও কেউ জানতে পারবে না। বিশ্বস্ত সূত্র অনুসারে এই পারাপারের রাস্তা দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনা এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরকের চোরাচালান হয়। সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে — সম্প্রতি একজন ভয়ানক সন্ত্রাসবাদী তার কিডনির চিকিৎসার জন্য এই রাস্তা দিয়েই বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসে চিকিৎসা করিয়ে আবার ফিরে গিয়েছে। ওই সূত্রটি জোরের সঙ্গে জানিয়েছে যে, এই একটিমাত্র এলাকা দিয়েই আমদানি রপ্তানীর নাম করে ৬০০ ট্রাক এবং সেইসঙ্গে আরও ৬০০ থেকে ৭০০ ট্রাক, সুমো, কোয়ালিস তথা অন্যান্য বাহনাদি ভারতে অবাধে যাতায়াত করে। আর ওই সব গাড়ি করে ভারতে ঢুকছে চোরাইমাল, পটাসিয়াম তথা এমোনিয়াম নাইট্রেট এবং আর ডি এক্স জাতীয় বিস্ফোরক, এ কে ৪৭/৫৬ সিরিজের রাইফেলের কার্তুজ ও রাইফেল, সেল্ফ টাইমার-এর মতো ভয়ঙ্কর জিনিস। সূত্রটির মতে ওই পেট্রাপোল বর্ডারের অপরদিকে সীমানার ওপারে বাংলাদেশের যশোরে রয়েছে কয়েক ডজন সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির এবং বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্রের ডিপো। আরও খবর হল, বিগত ছ'মাসে এই পথ ধরেই ভারতে ঢুকেছে প্রায় ২০০ কেজি পটাসিয়াম, দশ থেকে বারো হাজার কিলোগ্রাম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ৪০০ কেজি আর ডি এক্স জাতীয় বিস্ফোরক, ১০০০ কেজি সালফার, কালাসনিকভ রাইফেলের পঞ্চাশ হাজারের বেশি গুলি, ২০০০ জিলেটিন স্টিক, শত শত টাইমার, সস্তা দরের মোবাইল ফোন। সবই ট্রাকে করে এসেছে। ভারতে কাজ সেরে সন্ত্রাসবাদীদের নিজেদের লটবহর নিয়েই এপথ দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যায়। এটা তো শুধু একটা মাত্র এন্ট্রিপয়েন্টের বা প্রবেশপথের হিসাব। নদীপথ ও সমুদ্রপথের সংযোগ স্থলের ঘটনা তো আরও ভয়াবহ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসিচব অশোকমোহন চক্রবর্তীও জলপথে নজরদারির খামতি স্বীকার করে নিয়েছেন। কোস্টগার্ডকে আরও কড়া পাহারার কথা বলেছেন। দেশের অন্যান্য এলাকায় সীমান্তবর্তী জলসীমায় গভীর সমুদ্রে যে সকল জেলেরা মাছ ধরতে যায় তাদেরকে ভারতের কাস্টমস্ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী পরিচয়পত্র দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে ওই একই পরিচয়পত্র দেয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের শাখা বলে কথিত মৎস্যজীবী সঙ্ঘ। ওইসব জেলেদের নৌকার ভীড়ে ভারতীয় জলসীমার ওপার থেকে কীসব ভরে আনা হয় তা বোধহয় একমাত্র ভগবানই জানেন। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে বার বার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের কোনও হেল-দোল দেখা যায়নি। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল মুম্বাইয়ে ২৬ নভেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলা। তাজ ও ওবেরয় হোটেলে কবে থেকে আধুনিক হাতিয়ার জমা করে অস্ত্রাগার বানানো হয়েছিল তা কেউ জানে না। আগামী দিনেও জানা যাবে কি?

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম সরকার বেকারদের বঞ্চ না করছে

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতির কথা বলার আগে — একটি ভয়াবহ জরুরি ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর ২০০৮, ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডাক ধর্মঘট চলেছে, ২০ তারিখে স্বাভাবিক ডাক ব্যবস্থা চালু হয়নি। হাজার হাজার পরীক্ষার্থী তখনও অ্যাডমিট-কার্ড পাননি। বোধ হয় পাবেনও না। অতএব আবেদনপত্র বাতিল। এই ভাবেই হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতীর ভবিষ্যতকে অন্ধকার করে দিচ্ছে সিপিএম পরিচালিত সরকার।

আরও জানা গেল, ইতিপূর্বে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনও দু'টি পরীক্ষার জন্য হাজার হাজার প্রার্থীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে জমা নেয়। একটি পরীক্ষা তো হয়ইনি, সমস্ত টাকা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন নিঃশব্দে পকেটস্থ করেছে।

অপর পরীক্ষার জন্য সিপিএম নেতাদের নিকট আত্মীয়-স্বজন ও সুপারিশ পাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। বাকি দরখাস্ত বাতিল করা হয়েছে। এইভাবে হাজার হাজার যুবক-যুবতীদের টাকা প্রকারান্তরে লুণ্ঠন করা হচ্ছে না কি! কেউই প্রতিবাদ করেনি। কলকাতার মেয়র তো এসব খবরই রাখেন না। তিনি তো উদ্বোধনী কাজেই ব্যস্ত। তিনি আর পুরনির্বাচনে দাঁড়াবেন না—বিধানসভায় দাঁড়াবার আশ্বাস পেয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। কারণ তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবুর একান্তই ন্যাওটা।

কি নির্মম পরিহাস সিপিএম-এর যুব সংগঠনের — ব্রিগেডের সভায় চাকরির ফানুস ওড়ানো আর অপর দিকে বেকার যুবক-যুবতীদের এই লাঞ্ছনা। সিপিএম-নেতৃত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রী — কম্পিউটার শিখে চাকরি পাবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। সরকার জানাক, তাদের কম্পিউটার কেন্দ্রের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কতজন চাকরি পেয়েছেন।

সিপিএম নেতৃত্ব জেনে রাখুক, এই ঘটনা ব্যুমেরাং হয়ে যাবে। এই লাঞ্ছিত যুবক-যুবতীরা নির্বাচনে সিপিএম-এর বিরুদ্ধেই ভোট দেবে। সিপিএম-নেতৃত্ব এও জেনে রাখুন এর মধ্যে বেশ কিছু যুবক-যুবতী যারা সিপিএম-কে পছন্দ করতেন, তাঁদের কিন্তু মোহমুক্তি ঘটছে। সিপিএম নেতৃত্ব-কে মনে রাখতে হবে — ইন্দোনেশিয়াতে কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞে সেখানকার যুব সংগঠন সক্রিয় ছিল।

আর একটি প্রসঙ্গ তুলছি। হাজার হাজার যুবক-যুবতী মার্কেটিং কাজে বিভিন্ন ছোট-মাঝারি বড় সংস্থার কাজ করেন। এঁরা নিয়োগপত্র পান না, এঁদের পি এফ নেই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিস্তির কায়দায় বেতন (?) দেওয়া হয়। এঁদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এঁরাও একদিন সিপিএম বিরোধী হয়ে উঠবেন। আবার স্মরণ করিয়ে দিই, ইন্দোনেশিয়াতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও কমিউনিস্ট নিধনে অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি এম-এপরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল — যে সব ছাত্র নাকি "ফেল" করার যোগ্য তাঁরা ক্লাস পেলেন আর যাদের ১ম শ্রেণী পাওয়ার কথা তাঁরা "ফিউজ" হয়ে গেলেন।

শুধু এই নয়, দীর্ঘ কয়েকবছর যাবৎ বিভিন্ন পরীক্ষায় এই কীর্তি ঘটেছে — ঘটে চলেছে। এ বিষয়ে কেউই কিন্তু প্রতিবাদ করেন না কেন?

পেট্রোল ডিজেলের দাম কমেছে — বাস ট্রাম(?)-এর ভাড়া কমানোর কী ব্যবস্থা হবে। পরিবহনমন্ত্রী বিদেশ-ভ্রমণে আছেন। কেউ এ সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস পাবেন না। কারণ ব্যক্তিটি হলেন 'শ্রীকৃষ্ণের' বরপুত্র।

মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ নানা কারণে অখ্যাতি অর্জন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাজের দায়িত্ব

কর্মের অপেক্ষায় কর্মপ্রার্থীরা।

মন্ত্রী যোগেশ বর্মণকে দিয়ে সুশান্ত ঘোষকে একেবারেই শান্ত সমাধিতে কি পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন? রাজনীতিতে সবই সম্ভব — পার্টি একজনকে শুষে নিয়ে ছিবরে করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।

এবার বলি প্রাক্ নির্বাচনী রাজ্য রাজনীতি। কংগ্রেস-তৃণমূল ঐক্য নিয়ে অনেক কথা সংবাদে বেরুচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার কংগ্রেস বা তৃণমূল কেউই নিজেদের পায়ের তলার জমি ছাড়বে না — যদিও ঐক্য মানে দেওয়া-নেওয়া। দীপা মুন্সীর মুখ দিয়ে প্রিয়রঞ্জন গোষ্ঠী বলিয়েছে, কংগ্রেস নিজের পায়ের মাটি থেকে সরবে না। কেউ কেউ বলছেন, তৃণমূল যে আর এন ডি এ-তে নেই সেটা সরবে ঘোষণা করতে হবে। এই সময় বড়বাজারের কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ ব্যানার্জি তৃণমূলে যোগ দিলেন। তাঁর ইচ্ছেটা উত্তর কলকাতা লোকসভার সিটে প্রার্থী হওয়া। কাগজের খবর বলছে, এমন প্রতিশ্রুতি নাকি মমতা ব্যানার্জি দিয়েছেন। এদিকে উত্তর-এর এই কেন্দ্রে তৃণমূল বিধায়ক তারক ব্যানার্জি এবং সাধন পান্ডে প্রার্থী হতে চাইছেন। মমতা ব্যানার্জি সাধন পান্ডেকে মোটেই পছন্দ করেন না। সুতরাং তিনি বাদ যাবেনই। তারক ব্যানার্জি সম্বন্ধে তৃণমূলের একাংশ বলে বেড়াচ্ছেন তারকবাবু নাকি মুখ্যমন্ত্রীর খুব "প্রিয়"? কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার কাছ থেকে জানা গেল, কলকাতার উত্তরের এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রয়াত অজিত পাঁজার পুত্র ডাঃ প্রসূন পাঁজা অথবা তাঁর পত্নী ডাঃ শশী পাঁজাকে মনোনীত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বড়তলা মানিকতলা কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে সাধন পান্ডেকে প্রার্থী না করে পরেশ পাল-কে প্রার্থী করার দিকেই তৃণমূল নেত্রীর মন।

সিপিএম এখনও মন ঠিক না করলেও উত্তর কলকাতার লোকসভা কেন্দ্রে মহম্মদ সেলিমকে প্রার্থী করার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, তিনি বুদ্ধ বাবুর পারিবারিক বন্ধু। আর সুধাংশু শীল-কে মেয়র করার জন্য ২০১০ সালে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে প্রজেক্ট করা হবে।

বর্তমানে সিপিএম-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি লোকাল কমিটি এবং জোনাল কমিটি দাবি তুলেছে — "জেলা-কমিটি এবং রাজ্য কমিটির প্রতিটি সদস্য-এর মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা নিতে হবে।" পার্টিতে দাবি উঠেছে, মন্ত্রিসভা এবং রাজ্য নেতৃত্ব থেকে বিতর্কিত এবং ক্ষতদুষ্ট মন্ত্রী - নেতাদের সরিয়ে পার্টির ভাবমূর্তি ফেরত আনতে হবে।

আগেই লিখেছি, আবার লিখছি — সিপিএম পার্টির একাংশ চায় সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হোক। তা হলেই নেতাদের চৈতন্য উদয় হবে। মাছের পচন মাথা থেকেই শুরু হয়।

বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল — আর এস পি কর্মী সভা করে সিপিএম সম্পর্কে কন্ডুয়ন করলেন। কিন্তু শেষমেশ সিদ্ধান্ত হল, সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট ছাড়া চলবে না।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে আর এস পি-র প্রয়াত নেতা মাখন পাল আমাকে বলেছিলেন, "ক্ষমতার যে স্বাদ পাওয়া গেছে — সে ছেড়ে কেউই বিপ্লবের পথে এগোবে না। কেবল হুংকারই সার" লাভের গুড়ে পিঁপড়ের পা আটকে গেছে। তাই পর্বতের মুষিক প্রসব।

অন্যরকম

পাকীজা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাত তখন ২টো। হঠাৎই পাকীজার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙা মাত্রই কান্না। মা খেতে দাও। মেয়ের কান্নাতে মা'রও ঘুমটা ভেঙে গেল। আগে থেকেই খাবার অবশ্য তৈরি ছিল। মেয়ের চাওয়ার আগেই সব ঠিক-ঠাক। পাকীজার মা'রও অভ্যাস হয়ে গেছে — মেয়ের ডেলি রুটিনের সঙ্গে, মেয়ের জন্য খাবার নিয়ে এলেন তিনি। থালায় সাজানো বড় বড় কাঁচা লঙ্কা, মাঝারি সাইজের ইঁট-টুকরো, মশা মারার ধূপসহ হরেক ব্যঞ্জন। একী এগুলি কী খাবার! পাকীজা তো মেয়ে — রাক্ষসী নয়। কিন্তু তাতে কী! পাকীজার খাবার বলতে এগুলিই। এগুলিই ওর খিদে মেটায়। এসব খাবার শুধু রাত্রির নয়, দিন-রাতের খাবার বলতেও এইসবই। এই সব ছাই-ভস্ম খেয়েই পাকীজা বেঁচে থাকে। তবে একে ছাই-ভস্ম বললেও উপায় নেই। এই ছাই-ভস্ম ছাড়া পাকীজাও বাঁচতে পারবে না।

বিহারের ভাগলপুরের পাকীজার বয়স মাত্র তিন বছর। সবে মাত্র বয়সের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে। কিন্তু এই বয়সেই মুড়ি মুড়কির মতো কাঁচা লঙ্কা খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এই বয়সের বাচ্চারা লঙ্কার ভয়ে মিষ্টির শরণাপন্ন হয়, কিন্তু পাকীজার সেসব ভয় নেই। বরং বহুজাতিক কোম্পানীর চকোলেটের থেকেও এই সবই তার বেশি পছন্দ। শুধু কী লঙ্কা! ছোটো-মাঝারি ইটের টুকরো পর্যন্ত খেয়ে হজম করে দেয় সে। প্রতিবেশীরাও এখন জেনে গেছে এই মেয়ের খাদ্য তালিকা বেশ দীর্ঘ। দিনের কোনও না কোনও সময় পাকীজার প্রসঙ্গ প্রতিবেশীদের মধ্যেও ওঠে।

এমনকী মাতৃদুগ্ধের থেকেও পাকীজার

ইঁট ও কাঁচালঙ্কা খেতে ব্যস্ত পাকীজা।

পছন্দ নুড়ি-পাথর। এসব খেয়েই সারাদিন কাটিয়ে দেয়। গভীর রাতে আবার খিদে পায়। মা খাবার তৈরি রাখেন। নিজের মেয়েকে এ খাবার খাওয়াতে কী কোনও মা চান! কিন্তু উপায় কী? না দিলে, পাকীজা নিজেই নুড়ি-পাথর খুঁজতে শুরু করে। সবার সামনেই কড় কড় করে খেতে আরম্ভ করে। পাকীজার এসব খাবার সময় মুখে কোনও বিকৃতি আসে না। কষ্ট হয় না খেতে। এসব খেতে হয়তো নামজাদা ম্যাজিসিয়ানরাও রীতিমতো ভয় পাবে। পাকীজা দিনে যা লঙ্কা খায় কোনও ভোজ বাড়িতেও অত লঙ্কা লাগে না। পাকীজার ধ্যান-জ্ঞান বলতে এইসব কুখাদ্য।

তার এ কান্ডে হয়তো প্রতিবেশীরা হাততালি দেন। উল্লাস করেন। কিন্তু খুশি নন তার বাবা-মা। চিন্তিত তাঁরা। মেয়ের এমন রসনা প্রবৃত্তি কেন! ওর ভবিষ্যতের কী হবে? —এইসব প্রশ্নই এখন তাঁদের ভাবায়। চিকিৎসকদেরও শরণাপন্ন হয়েছেন পাকীজার মা-বাবা। ডাক্তারদের মতে, পাকীজার এই অভ্যাস ক্ষতি করতে পারে তার শরীরের। ইনফেকশন হবার সম্ভাবনাও অনেক। লিভারের কার্যশক্তিও কমে যাবে।

পাকীজা কিন্তু এসব বোঝে না। সে শিশু। প্রতিবেশীরাও আনন্দ পায় পাকীজাকে ইঁট আর লঙ্কা খেতে দেখে। তাদেরকে অবশ্য তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতে হয় না। যখন যে যেটা দেয় পাকীজা সানন্দে তা খেয়ে নেয়। আর হজম! হজমও দিব্যি হয়ে যায়।

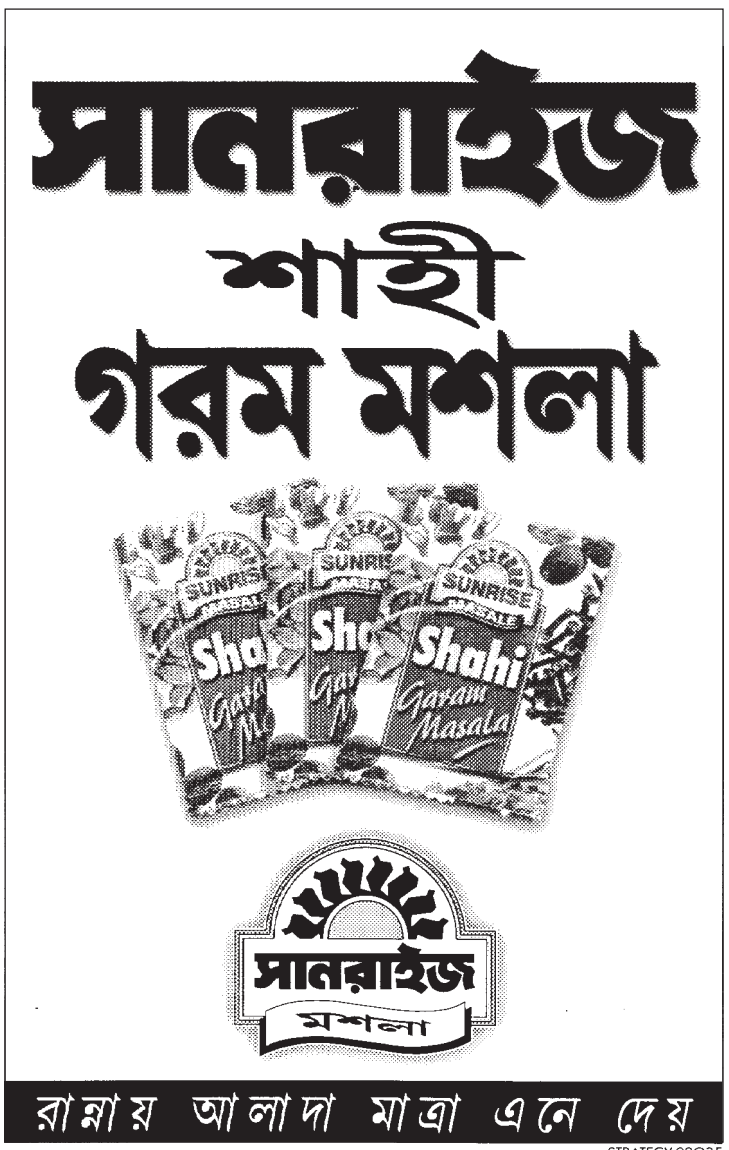

হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত

মালদার রথবাড়ি স্কুলে গরুর ঠ্যাং

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। ঈদের পরে মালদা জেলার একটি বিদ্যালয় ও একটি মন্দিরের সামনে গরুর চোয়াল ও ঠ্যাং ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনায় হিন্দুরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ঈদের দিন রাতে মালদা জেলার মোথাবাড়ি ব্লকের রথবাড়ি অঞ্চলের হাই স্কুলের অফিস ঘর, স্টাফরুম ও দরজায় গরুর চোয়াল, ঠ্যাং এবং উটের চোয়াল টাঙিয়ে রাখা হয়। স্থানীয় হিন্দুরা এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে স্কুল সাত দিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে এবং দোষীদের খুঁজে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে। ঈদের ছুটি না বাড়ানোর জন্যই এই রকম বীভৎস ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে তারা প্রশাসনকে জানিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, কোনও গণমাধ্যমই এই পৈশাচিক ঘটনার খবর প্রকাশ করতে সাহস করেনি। পুলিশ প্রশাসন এই সাতদিনের মধ্যে দোষীদের খুঁজে গ্রেপ্তার করতে না পারলে গ্রামবাসীরা স্কুল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বনধের আওয়াজ তুলেছে। স্কুলের সামনে পুলিশ ক্যাম্প বসলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও দুস্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এলাকার রাজনৈতিক দলগুলির বেশিরভাগ নেতা মুসলিম হওয়ার জন্য ঘটনাটি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

একই দিনে গাজোল থানার মুড়িয়াকুণ্ড গ্রামের শিবমন্দিরে মুসলিম দুস্কৃতীরা গরুর ঠ্যাং ঝুলিয়ে দেয়। সেখানেও গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায়। পুলিশ এখানেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বকরীদে গরু কাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবুও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইন বলবৎ করেনি।

গুয়াহাটিতে বিমান-কারাত

সন্ত্রাসবাদ নয়, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদই বড় বিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি প্রকাশ কারাত অসমে গিয়ে অসমের অভিবাসী সমস্যা ও বন্যা সমস্যার সমাধান করেনি বলে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার এবং বিগত এন ডি এ সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। অথচ বন্যা তো দূরের কথা, পশ্চিমবঙ্গে তারা একটানা বত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও এক-আধ ঘন্টার বৃষ্টিতে খোদ কলকাতা জলবন্দী হয়ে পড়ে কেন — এই প্রশ্নের তারা কী উত্তর দেবেন?

কারাত সাহেব-এর ১৪ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল— 'সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা'। অথচ একবারও ওঠেনি গুয়াহাটির ভয়াবহ বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ। কার্যত হয়ে গেল প্রাক্ নির্বাচনী বক্তৃতা। তিনি সেখানে অসমীয়া জনতাকে খোয়াব দেখালেন — চন্দ্রবাবুর টি ডি পি, জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয় ফ্রন্টের সরকার গড়ার।

সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক এজিপি-কে বিজেপি-র সঙ্গ ছেড়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন। বিজেপি-র হিন্দুত্ব ভিত্তিক রাজনীতি নাকি অসমের জনসংখ্যার বৈচিত্র্যের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। যে মনমোহন সিং সরকারকে

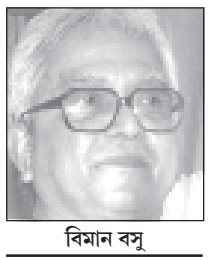

বিমান বসু

প্রকাশ কারাত

একদা দিল খুলে সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁকেও কড়া সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েননি। কারাতের কথায় মনমোহন যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ভুলে এখন নাকি এন ডি এ-রই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। বিশেষ করে, পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে। অথচ একটি শব্দও খরচ করেননি মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বা বাংলাদেশের বদমায়েসি নিয়ে। বরং কটাক্ষ করে গেছেন মালেগাঁও বা হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ বিষয়ে হিন্দুদের ভূমিকা বিষয়ে। অথচ ঘটনাটি সাবজুডিস বা বিচারাধীন যা নিয়ে মন্তব্য করা যায় না। যখন সংসদে মুম্বাইয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে সব দল একসুরে কথা বলছেন, তখন কারাত-বিমানরা অভিযোগ করছেন — সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক রং লাগিয়ে বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সচেষ্ট। পলিটব্যুরো সদস্য বিমানবাবু আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে মুসলিম সন্ত্রাসবাদকে বাদ দিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তাদের সর্বহারাদের কম্যুনিস্ট পার্টির হাল হকিকতটা কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায়? তবে কিনা সাম্যবাদীরা বরাবরই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে সার জল যোগান দিয়ে এসেছেন সেই ১৯৪৬ সাল থেকেই।

অসমের শনবিল জাতীয় জলাশয়

সংবাদদাতা ।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম বিল করিমগঞ্জ জেলার 'শনবিল'-কে ভারত সরকার জাতীয় জলাশয়-এর স্বীকৃতি প্রদান করল। কেন্দ্র সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রক 'শনবিল'-কে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় একলক্ষ মৎস্যজীবী ওই শনবিলের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এই জলাশয়ের মাছের খ্যাতিও অসম জুড়ে রয়েছে। এই জলাশয়ে রয়েছে সত্তর রকম ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছ। এরমধ্যে বেশ কিছু মাছ রয়েছে বিরল প্রজাতির। সরকারের এই ঘোষণায় স্বভাবতই উল্লসিত এলাকার মৎস্যজীবীরা। সরকারি রক্ষণাবেক্ষণে তারা জীবিকা অর্জনে অনেক বেশি করে সুবিধা পাবেন বলে মনে করছেন।

শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস কর দীর্ঘদিন ধরে সরকারি স্তরে 'শনবিল' নিয়ে চেষ্টা করে আসছেন। শনবিলের পরিবেশ রক্ষার উপযোগিতা, আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব এবং সর্বোপরি শনবিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রয়াসী ডঃ কর। এবার তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেননা, শনবিলকে জাতীয় জলাশয়ের মর্যাদা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে গেছেন শিলচরের সাংসদ এবং কেন্দ্রের ভারী শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব, অসম সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা এবং সংসদীয় সচিব অজিত সিং প্রমুখ।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

গ্রামীণ ডাক সেবক ইউনিয়নের সম্মেলন

সংবাদদাতা ।। মালদা শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতীয় গ্রামীণ ডাক সেবক ইউনিয়নের একাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন। গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বি এম এস, জি ই এন সি দ্বারা অনুমোদিত এই দুই দিনের সম্মেলনে সারা ভারত থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাপতি হিসাবে সঞ্জীব মিশ্র এবং সর্বভারতীয় সম্পাদক বৈজনাথ রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

নেপালে পাচার হওয়ার আগেই সাতটি প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার

হি. স. কলকাতা ।। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নেপালে পাচার হওয়ার আগেই সাতটি প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করল নকশালবাড়ি কাস্ট মস ডিভিশনাল প্রিভেন্টিভ ইউনিট। কাস্ট মস সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের কাছে আগেই খবর ছিল যে বেশ কিছু দেব-দেবীর প্রাচীন মূর্তি চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত হয়ে নেপালে পাচার হবে। কাস্ট মস কর্মীরা ভ্যানটিকে আটক করলে রাতের অন্ধকারের সুযোগে নদী পার হয়ে নেপালের দিকে পালিয়ে যায় ভ্যানচালক। কাস্ট মস কর্মীরা রিকশাভ্যানে থাকা বস্তাগুলি খুলে দেখেন সেগুলির মধ্যে খড় দিয়ে মোড়া সাতটি মূর্তি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুটি গণেশ মূর্তি, একটি করে বিষ্ণু, উমা-পার্বতী, সূর্য এবং বরাহ মূর্তি। মূর্তিগুলি কালো কষ্টিপাথর ও বেলেপাথরের তৈরি। উদ্ধার করা মূর্তিগুলি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিজয়কুমার সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য। তিনি জানান, মূর্তিগুলি সবই একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীর আগে তৈরি। এগুলির মূল্য আনুমানিক ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে এই মূর্তিগুলির মূল্য কয়েক কোটি টাকা বলে কাস্ট মস সূত্রে জানানো হয়েছে। এই সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে বেশ কিছু মন্দির ধ্বংসের আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দারা মূর্তিগুলি রক্ষার জন্য হয় পুকুরে ফেলে দিতেন কিংবা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন। এই মূর্তিগুলি সেগুলিরই একটা অংশ।

বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে এদেশে ঢুকে নেপাল হয়ে অন্যত্র পাচার হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নেপালে ঢোকার আগেই কাস্ট মস বিভাগের তৎপরতায় সেগুলিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যে সব মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে বিষ্ণু মূর্তিটি লম্বায় ২৫ ইঞ্চি, ওজন প্রায় ১৭ কেজি, দুটি গণেশ মূর্তির মধ্যে একটির ওজন প্রায় সওয়া চার কেজি, উচ্চতা সাড়ে ১৩ ইঞ্চি এবং অন্যটির ওজন প্রায় সাড়ে আট কেজি, উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি, উমা-পার্বতীর মূর্তিটির সাড়ে ১৫ ইঞ্চি উচ্চতা এবং ওজন প্রায় ৬ কেজি, ২০ কেজি ওজনের সূর্য মূর্তিটির উচ্চতা সাড়ে ১৯ ইঞ্চি এবং বরাহ মূর্তির ওজন ৩৫.৭ কেজি এবং উচ্চতা ২০ ইঞ্চি ।

অসমে বিশাল কংগ্রেস কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন এ আই সি সি অসম প্রদেশ সমিতি সম্প্রতি পুনর্গঠন করল। আগের রাজ্য সভাপতি ভুবনেশ্বর কলিতা স্বপদে বহাল থাকলেও এবারের বিশালায়তন রাজ্য সমিতিতে অনেক নতুন মুখ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের অনেকে আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর বিরোধী গোষ্ঠীর বলে জানা গেছে।

এর ফলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে অসমে দলের ভরাডুবির দায়টা পড়বে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর উপর।

এবার প্রদেশ সমিতির আকার-আয়তনে যে বিশাল, তাতে বোধ হয় বিশ্বরেকর্ড-এর অধিকারী হয়ে গেছে। নতুন সমিতিতে আছেন ১৭ জন সহ-সভাপতি, ১৭ জন সাধারণ সম্পাদক এবং ২৮ জন সম্পাদক। আবার বেশ কিছু জেলা কংগ্রেস কমিটিও পুনর্গঠিত করা হয়েছে। সেখানেও নিশ্চয়ই পদাধিকারীদের সংখ্যা কম নেই।

প্রদেশ কংগ্রেসের জাম্বো সমিতির পক্ষে সাফাই গেয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ ভূমিধর বর্মনের বক্তব্য, সকল এম পি-ই তো পদাধিকার বলে এ আই সি সি-এর সদস্য।

মণিপুরেই বারো'শ বনৌষধি

শুধু ভারতের মণিপুর রাজ্যেই রয়েছে ১২০০ রকমারি বনস্পতি। মণিপুরে বনমন্ত্রী দেবেন্দ্র সিং ইম্ফলে ভেষজ ওষুধ তৈরির কেন্দ্র খোলার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১২ ডিসেম্বর ইম্ফলে ঔষধি এবং ঔষধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে তিন দিনের এক সম্মেলনে বনমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। এসোসিয়েশন অফ্ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস্ (এশিয়ান) এবং 'বে অফ বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এ্যাণ্ড ইকনমিক কো-অপারেশন' সংগঠন ভুক্ত দেশগুলির উদ্যোগে এই সম্মেলন হয়। মন্ত্রী আরও জানান, ইম্ফলে কেন্দ্র স্থাপিত হলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলো থেকে সহজে কাঁচামাল পাওয়া যাবে। এলাকার মানুষের জন্য সুলভে উন্নতমানের আয়ুর্বেদিক বা ভেষজ ওষুধ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

মণিপুরে প্রায় বারো'শ রকমের ঔষধি বৃক্ষ, লতা-গুল্ম রয়েছে। এরমধ্যে তিন'শ রকম ঔষধি বৃক্ষ বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বনদপ্তরের প্রতিনিধি এবং লাওস, ভূটান, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড, ব্রুনেই ও কম্বোডিয়া থেকে একজন করে প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন।

ভারতে প্রায় সতেরো হাজার রকম ঔষধি, বৃক্ষ, লতা-গুল্ম রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ছয় হাজার সম্বন্ধে তথ্য সংকলন করা হয়েছে। আর মাত্র ষাট রকম ব্যবহৃত হচ্ছে ভেষজ ঔষধ উৎপাদনে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়। চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

কেরল, অসমের পর মহারাষ্ট্র

মুসলিমদের রাজনৈতিক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহারাষ্ট্রেও অসমের ধাঁচে মুসলমানদের আলাদা এক রাজনৈতিক দল এবারে লোকসভা নির্বাচনের আগেই গঠিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। উদ্যোক্তা অসমের সেই নওগাঁবাসী ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমল। এখন আর আগের মতো সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নয় — পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত প্রাদেশিক দল। ক'দিন আগেই কেরলে এরকম দল গঠনের কথা সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে। অসমে বদরুদ্দিন আজমলরা আগে মাইনরিটি ফ্রন্ট এবং পরে সাইনবোর্ড বদল করে অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গড়ে গত বিধানসভার নির্বাচনে সাফল্যলাভ করেছেন। অসমের অনুকরণে মহারাষ্ট্রেও দলের নাম ঠিক হয়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে — মহারাষ্ট্র ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফন্ট।

মুম্বাই-এর মেরিন লাইনে বিড়লা মাতশ্রী হলে কয়েক ডজন উলেমা এবং মুসলিম এনজিও মিলে এক সভায় একত্রিত হয়ে নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। ওই সভায় বক্তব্য রাখার সময় মৌলানা ও উলেমারা কংগ্রেসের তথাকথিত সেক্যুলারইজমকে তুলোধুনা করেন। তারা মুসলমানদের এবং সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে নতুন দলে দলে যোগ দেওয়ার তথা সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন। এর ফলে তারা দেশের উন্নতিতে তাদের সমাজে যোগদান (পড়ুন মুসলিম স্বার্থরক্ষায়) নিশ্চিত করবেন বলে আশা করেছেন। উদ্যোক্তা আজমল মিঞার সাফ কথা, এটা মুসলিম লীগের নতুন সংস্করণ নয়। এই দল হবে সেই সকল বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যারা বিজেপি ও কংগ্রেস বিরোধী মোর্চা গড়তে চান। অসমে বদরুদ্দিন আজমল তাঁর এরকম প্রয়োগে সফল হয়েছেন। অসম বিধানসভার বিগত নির্বাচনে দল (এ ইউ ডি এফ) ৭৩ জন প্রার্থী দিয়েছিল। তাদের মধ্যে দশজন জয়লাভ করেছে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অসম বিধানসভায় বোড়ো জনজাতিদের দল 'বোড়ো পীপুলস্ প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট' বারোটি আসন পেয়ে বর্তমান শাসক দল কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারে যোগদান করে। ফলে বদরুদ্দিন-এর কংগ্রেসকে সমর্থনের বদলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। মৌলানা আজমলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল — মহারাষ্ট্রে অসমের মতো পরীক্ষা সফল হবে কিনা? তার উত্তরে আজমল বলেন, এই ফ্রন্ট শুধুমাত্র মুসলমানদের লক্ষ্য করে হয়নি।

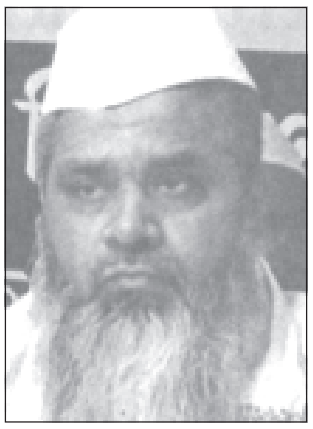

বদরুদ্দিন আজমল

মৌলানা আজমল আবার জমিয়ত উলেমা এ হিন্দ-্এর অসম শাখার সভাপতি এবং নবগঠিত এ ইউ ডি এফ-এরও সভাপতি এবং দলের নওগাঁ থেকে নির্বাচিত বিধায়ক। জমিয়ত উলেমা-এ হিন্দ্ দেওবন্দী উলেমাদের এক প্রভাবশালী সংগঠন। তবে আজমল সাহেব আত্মবিশ্বাসী যে, জমিয়তের ক্যাডাররা তাঁর দলের জন্য জান লড়িয়ে সমর্থন জানাবেন। এবং দলের ভবিষ্যৎ উল্লেখ

প্রাণায়াম অভ্যাসে চিকিৎসকদের পরামর্শ

বি স কে, কলকাতা ।। কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকরা নিজেদের সুস্থ রাখতে প্রাণায়াম করছেন। স্বামী রামদেবের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম যে তাদের সুস্থ রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করছে তা তারা নিজেরাই বলে বেড়াচ্ছেন। চিকিৎসকদের সারাদিন রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। শল্য চিকিৎসকদের তো টেনশন নামক ব্যাধি অত্যন্ত প্রবল।

ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায় ভোগেন তারা। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক রামদেবের পরামর্শ মেনে অনেক ভাল আছেন। এদের মধ্যে এইমস্-এর তমোনাশ চৌধুরী, কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রবীণ শল্য চিকিৎসক তুষার মন্ডল, এস এস কে এম-এর রণেন দাশগুপ্ত রামদেবের নির্দেশিত পথে প্রাণায়াম করে সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এদের অনুসরণ করে অন্যান্য অনেক চিকিৎসক নিয়মিত প্রাণায়াম তো করছেনই, রোগীদেরও স্বামী রামদেব নির্দেশিত প্রাণায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মিজোরাম — পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হল। এই নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে গত ৮ ডিসেম্বর। এতে অবশ্যই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস ও বি জে পি। দিল্লী, রাজস্থান ও মিজোরামে কংগ্রেস এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বি জে পি সরকার গঠন করেছে। অঙ্কের হিসেবে কংগ্রেস বি জে পি-র আনুপাতিক অবস্থা হল ৩ : ২।

কোনও কোনও সংবাদপত্র হেডিং করেছে 'কংগ্রেস হাসল, বি জে পি গম্ভীর।' কিন্তু অতি সরলীকরণের দিকে না গিয়ে, বিষয়টা নিয়ে একটু বিচার বিশ্লেষণ করা যাক।

১. দিল্লী মোট আসন - ৭০
কংগ্রেস - ৪২
বি জে পি - ২৩
অন্যান্য - ৪

অবশ্যই কংগ্রেস এই রাজ্যে বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। যেক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য দরকার ছিল ৩৬টা আসন, কংগ্রেস পেয়েছে ৪২টা অর্থাৎ বাড়তি ৬ টা। বসপা (১) ও অন্যান্যদের একত্রিত করলেও বি জে পি কাছাকাছি আসতে পারছে না, বিরোধীদের মোট আসন দাঁড়াচ্ছে ২৭।

কংগ্রেসের পক্ষে আরও কৃতিত্বের কথা হল এই নিয়ে কংগ্রেস এই রাজ্যে পরপর তিনবার ক্ষমতা দখল করল। বেশ কিছুদিন ধরে ভোট-প্রচারের ধারা দেখে মনে হয়েছিল দিল্লী এবার বি জে পি-র দখলেই যাবে, অনেকে মালহোত্রাকে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ধরেই নিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত তাঁর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দিল্লী যে বি জে পি নেতৃত্বকে হতাশ করেছে-এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

২. রাজস্থান ঃ মোট আসন - ২০০

এই রাজ্যে বি জে পি-কে হারিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেছে। তবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য সেক্ষেত্রে দরকার ছিল ১০১টা আসন, কংগ্রেস পেয়েছে ৯৬টা। নীচের হিসেবটা একটু দেখা যাক —

কংগ্রেস — ৯৬
বি জে পি — ৭৮
ব স পা — ৬
অন্যান্য — ২০

অর্থাৎ কংগ্রেস কিন্তু বি জে পি-র চেয়ে ১৮টা বেশি আসন পেয়েছে। অন্যান্যদের হাতে আছে ২৬টা আসন। সুতরাং দল ভাঙাভাঙির খেলায় জয়ী হতে হলে বি জে পি-কে ১৯টা আসন যোগাড় করতে হবে সেটা এখন অসম্ভব বলেই মনে হয়।

৩. মিজোরাম ঃ মোট আসন - ৪০
কংগ্রেস — ৩২
এম এন এফ — ৩
বি জে পি — ০
অন্যান্য — ৫

এক্ষেত্রে বি জে পি কিন্তু কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেনি সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে। মনে হয়েছিল — আঞ্চলিক দল এম এন এফ ভাল ফল করবে। কিন্তু এই দলও দাঁড়াতেই পারেনি। সেক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য কংগ্রেসের দরকার ছিল ২১টা আসন, কংগ্রেস পেয়েছে ১১টা বেশি। কংগ্রেসের সংগঠন যে মোটামুটি ভাবে ছড়ানো, সেটা মিজোরামের নির্বাচনী ফলের দ্বারা আবার প্রমাণিত হয়েছে।

৪. মধ্যপ্রদেশ ঃ মোট আসন ২৩০

শিবরাজ সিং চৌহান

শীলা দীক্ষিত

বসুন্ধরা রাজে

ডঃ রমণ সিং

জোরামথাঙ্গা

বি জে পি — ১৪৪
কংগ্রেস — ৭০
ব স পা — ১০
অন্যান্য — ৬

এই রাজ্যে কিন্তু বি জে পি-র চমকপ্রদ সাফল্য এসেছে এবং তার ফলে শাসন ক্ষমতা আবার গেছে তাদেরই হাতে। সেক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য দরকার ছিল ১১৬টা আসন। এই দল পেয়েছে ১৪৪টা — অর্থাৎ ২৮টা বেশি। আর কংগ্রেসের সঙ্গে তার আসনের পার্থক্যটা বিরাট — ৭৪টা। বলা বাহুল্য বি জে পি-র আসন এবার কংগ্রেসের দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে । এই ব্যাপারে বি জে পি নেতৃত্ব গর্ববোধ করতেই পারে।

৫. ছত্তিশগড় ঃ মোট আসন — ৯০
বি জে পি — ৪৯
কংগ্রেস — ৩৭
ব স পা — ২
অন্যান্য — ২

এক্ষত্রেও বি জে পি কিন্তু কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতা বজায় রেখেছে। এটাও লক্ষণীয় যে, ৪৬টা আসন পেলেই এই দল নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেত — কিন্তু এই দল বাড়তি ৩টে আসন পেয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তার আসনগত পার্থক্য হল ১২। অন্যান্যদের হাতে আছে মাত্র ৪টা আসন। সুতরাং ' হার হাইনেস' ভারত সম্রাজ্ঞী যদি চানও কংগ্রেস বিধানসভায় বিরোধীদের নিয়ে বড়সড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে না।

এই নির্বাচনে কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, লড়াইটা চলছে দুই প্রধানের মধ্যে। সি পি আই (এম) দল রাজস্থানে ৩টে আসনে জিতলেও সি পি আই কোনও আসনই পায়নি। মধ্যপ্রদেশে গত নির্বাচনে সি পি আই (এম) ১টা আসনে জিতলেও এবার ১২টা আসনে প্রার্থী দিয়ে কোনও আসনই পায়নি। সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি যথাক্রমে ২১টা, ১১ টা ও ২ টো আসনে লড়েও কিছু করতে পারেনি।

আর দিল্লীতে সি পি আই (এম) ৪টা এবং সি পি আই ৫টা আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। সব জায়গাতেই তাদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, তথাকথিত বামদের দৌড় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলেই। পাঁচটা রাজ্যে সি পি আই (এম) -এর আসন মাত্র ৩।

দ্বিতীয়ত, বসপা তুলনামূলকভাবে কিছুটা এগিয়েছে। দিল্লীতে ১টা, রাজস্থানে ৬টা, মধ্যপ্রদেশে ১০টা এবং ছত্তিশগড়ে ২টো আসন পেয়েছে এই দল। অর্থাৎ এই নির্বাচনে তার ভাগ্যে জুটেছে মোট ১৯টা আসন।

তৃতীয়ত, বি জে পি দুটো রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। কংগ্রেস দিল্লীতে ক্ষমতা ধরে রেখেছে এবং রাজস্থান ও মিজোরাম দখল করেছে। সেই বিচারে তার সাফল্যটা বেশি।

আর সব চেয়ে বড় কথা হল — পরমাণু চুক্তি, আর্থিক মন্দা, জঙ্গি হানা ইত্যাদি সর্বভারতীয় বিষয়গুলোর তেমন প্রভাব পড়েনি এই ভোটে। যেখানে কংগ্রেসের বিরাট ধাক্কা যাওয়ার কথা, সেখানে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। মনে হয় আঞ্চলিক বিষয়গুলোই ভোটারদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। সুতরাং এই ভোটের ফলাফলের দ্বারা আগামী লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের আভাস কতটা পাওয়া যাবে সেটা পরিষ্কার নয়।

তবে সেই সঙ্গে এটাও বলি — কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৮৮৫ সালে, আর বি জে পি-র আবির্ভাব ঘটেছে ১৯৮০ সালে। ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেসের চেয়ে এক শতাব্দী পরে এসে বি জে পি তার পাশাপাশি ছুটছে। এটা কম কথা?

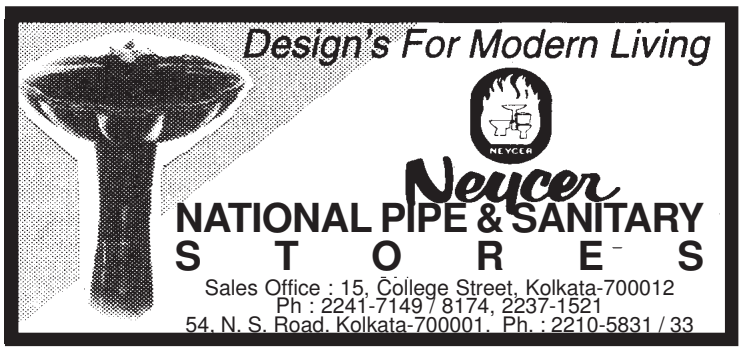

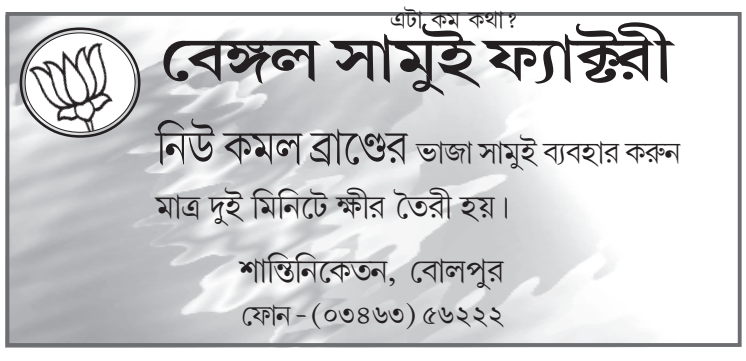

গল্প

পতিতোদ্ধার

হরিপদ পাল

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে। পরাধীনতার আমলে নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া।

এখন আমরা স্বাধীন। এখন নেতা ও মন্ত্রীদের বড় কাজ হল দেশগঠন করা। সমাজের পঙ্কিলতা ও ক্লেদ দূর করতে হবে, কোনও রন্ধ্রে যাতে দুর্নীতি বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর সর্বোপরি যারা নীচে পড়ে আছে, তাদেরকে টেনে তুলতে হবে, উঁচু-নীচু ও অস্পৃশ্যতার বিভেদ দূর করে দুর্নীতিমুক্ত একটা স্বচ্ছ সমাজ গঠন করতে হবে।

কিন্তু একাজ বড় কঠিন। কঠিন হলেও তো কাজ ফেলে রাখা যায় না। জাতির জনক বর্তমানে আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও কাজকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু গদীতে বসলে তো চলবে না। গণতন্ত্রের কথা ভাবতে হবে, ভোটের কথা ভাবতে হবে, ভোটারদের কথা ভাবতে হবে। কত রকমের ভোট আছে। এই ভোট হল দেশের মস্তবড় সম্পদ। এই সম্পদ যে আয়ত্ত করতে পারবে সেই রাজা। তাই ভোটের জন্য ভোটারদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হবে। ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে হবে।
সেজন্য তাদের খিদমৎ করতে হবে।

উপরতলা থেকে খাদি পরিহিত নেতা ও মন্ত্রীদের কাছে ফরমান এসেছে — হরিজনদের সাথে, চর্মকারদের সাথে ও সকল প্রকার নীচুতলার লোকেদের সাথে মিশতে হবে, পাড়ায় পাড়ায় এদেরকে নিয়ে মিটিং করতে হবে, মঞ্চে এদেরকে নিয়ে পাশাপাশি বসতে হবে, ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার করলে চলবে না। "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না সখী, দাঁড়াও এখানে"—এই নীতি এখন চলবে না। বিভেদের বাতাবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এই কাজ খুবই মহৎ, কিন্তু কঠিন। এই কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে জাতির পিতা স্বর্গে থেকেও বড়ই খুশী হবেন।

এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এতদঞ্চলের ডাকসাইটে জন দরদী নেতা এবং এম এল এ হরিহর চাটুজ্যে মশাই দলীয় কর্মীদের ডেকে পাঠালেন। তিনি কর্মীদের নির্দেশ দিলেন — লেবুতলার মাঠে সমস্ত পতিত সম্প্রদায়ের লোকেদেরকে সমবেত করতে। নেতার নির্দেশে উঠে পড়ে কাজে নেমে পড়ল কর্মীরা। পতিত সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে যোগাযোগ করা হলো। লেবুতলার মাঠে মিটিং-এর তারিখ ও সময় মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো।

সাহিত্যের পাতা

বিরাট সাড়াও পাওয়া গেল। এ ধরনের সমাবেশ এতদঞ্চলে নতুন। দুর্গাপূজার পর সমাবেশের দিন ঠিক করা হলো। পতিত শ্রেণীর নারী-পুরুষ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর কৌতূহলী জনতাও অধিক সংখ্যায় হাজির হলো।

বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া ভাল ছিল। বিকেলের মনোরম পরিবেশে মিটিং শুরু হলো। অভিনব সমাবেশ। সমাবেশে জনসমাগম দেখে হরিহরবাবু খুশীতে ডগমগ। তাঁর ইচ্ছা সফল হতে চলেছে। হরিজন সমাজের মাথা বিশ্বনাথ রামকে সভার সভাপতি করা হলো। পুষ্পমাল্য দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হলো। সভাপতির পাশেই হরিহরবাবু বসেছেন। বিশ্বনাথ রাম সঙ্কোচ বোধ করছেন। এত বড় একজন নেতার পাশে বসা চাট্টিখানি কথা নয়।

সভার কাজ শুরু হলো। যুবকরা আজ খাদির ধুতি-পাজামা-পাঞ্জাবী আর জাতির জনকের প্রিয় টুপি পরে ঘোরাঘুরি করছেন। ২/৪ জন যুবনেতা বক্তব্য রাখলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই গান্ধীজীর মহান আদর্শের কথা তুলে ধরলেন।

এবার সভাপতি বিশ্বনাথ রাম উঠে দাঁড়ালেন। সভাপতির ভাষণ হবে। কিন্তু কি বলবেন তিনি। মুখ থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। বলার অভ্যাস নেই। জনসমুদ্র দেখে স্তম্ভিত। কণ্ঠ রুদ্ধ। নিরক্ষর বলে কিছু লিখে আনতেও পারেননি। পিছন থেকে একজন যুবক তাঁর কানের কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু বলল। তাই শুনে তিনি বললেন, "সবাইকে ধন্যবাদ। আজ এখানে সভার কাজ শেষ হলো।"

সভাপতির ভাষণের আগেই একজন যুবকর্মী মাইকে ঘোষণা করলো, "বন্ধুগণ, দয়া করে কেউ যাবেন না। সভাশেষে সবাইকে মুড়ি-বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে।"

কয়েক হাজার ছোট ছোট মুড়ি-বাতাসার প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হরিজন যুবকরা হাতে হাতে সবাইকে সেগুলো বিতরণ করতে লাগল। মঞ্চে বসে হরিহরবাবু ও অন্যান্য সকলেই মুড়ি-বাতাসা খেলেন। তাদের হাতে জলও খেলেন। সাংবাদিকরা ক্লিক-ক্লিক করে ফটোও তুলে নিলেন।

এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা। হরিহরবাবুর বাড়ির পাশ দিয়েই হরিজনপল্লীতে যাওয়ার রাস্তা। বিশ্বনাথ রাম এবং তাঁর সঙ্গীরা হরিহরবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলেন। কয়েকজন সাংবাদিকও তাঁদের পিছে পিছে চলেছেন।

হরিহরবাবুর বাড়ির গেটের সামনে এসে সকলেই একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁর স্ত্রী এবং বাড়ির লোকজন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। গেটের সামনে জলভর্তি ছোট বড় ২/৩টি বালতি, জলের উপরে কয়েকটি তুলসীপাতা ভাসছে। একটু দূরে পাটকাঠির আগুন জ্বলছে। ওঁর স্ত্রীর হাতে একটা বাটি। বাটিতে লালচে একটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে।

সবেমাত্র সকলেই গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। একটু আধটু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে। 'গেটের সামনে এসব দেখে সকলের একটু কৌতূহল হল।

একজন সাংবাদিক বললেন, "মাসীমা, এসব কি?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, "দেখো না, তোমার মেসোমশাই পতিত উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। অজাত-কুজাতের ছোঁয়া খাবার আর জল খেয়েছে। আমি কি ওঁকে চান না করিয়ে, আগুন না ছুঁইয়ে আর গোবর জল না খাইয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেব!" বলার সাথে সাথে হাতের বাটিটা মাটিতে রেখে এক বালতি জল ঝপ্ ঝপ্ করে হরিহরবাবুর মাথায় ঢেলে দিলেন।

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®

সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

ভ্রমণ কথা

দার্জিলিং অভি

রুনা চৌধুরী (রায়)

খুব ছোটবেলায় ভারত স্কাউট্‌স এন্ড গাইডের তরফ থেকে একবার দার্জিলিং যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। শেয়ালদা থেকে সকাল ন'টার ট্রেনে চড়ে দশ ঘন্টা জার্নির পর সুকরীগলি ঘাট থেকে স্টিমার চড়ে আধঘন্টা গঙ্গার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে রামপুরহাট ঘাটে উপনীত হলাম। ওখান থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে এ্যাডভেঞ্চার পূর্ণ করতে জার্নির পর শিলিগুড়ি নামতেই রিজার্ভ বাসে গিয়ে বসলাম গয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। যেখানে উঁচু পাহাড়ের শৈলশিখরে এম এল এ ইলা পাল চৌধুরীর বাংলোতে আমাদের একুশ দিনের ক্যাম্প বসেছিল। একদিন নীল রং-এর ছোট ছোট ট্রয় ট্রেনে চড়ে দার্জিলিং-এ ঘুরে এলাম। আঁকা-বাঁকা সর্পিল পথ কেটে টয় ট্রেন দার্জিলিং স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর পরিণত বয়সে আরও দুবার দার্জিলিং যাওয়ার সৌভাগ্য হল, সঙ্গে সেবার গ্যাংটকের নাম তালিকাভুক্ত ছিল। ধর্মতলায় বাসে গুমটি থেকে এ সি কোচে বসলেই বাস ছুটবে শিলিগুড়ি। ভোরবেলায় শিলিগুড়িতে অবতরণের পরই নেপালী কাঞ্ছারা এবং বাঙালি ড্রাইভার কনডাক্টর ছুটে আসবে দার্জিলিং-এ ঘুরিয়ে আনার জন্যে। দরদাম করে আমরাও উঠে বসলাম জীপে। ছুটে চলে জীপ দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা কেটে কেটে ক্রমশই উঁচু আরও উঁচু শৈল সবুজ অরণ্যানি ভেদ করে দার্জিলিং-এর হিমগিরি অভিমুখে।

দার্জিলিং স্টেশনের পাদদেশেই স্নো-ভিউ হোটেলের অতিথি হয়ে রঙিন কাঠের ছিমছাম হোটেলটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। সেইরাতে হোটেলের ডাইনিং রুমে সম্পূর্ণ বাঙালি কায়দায় ডিনার সারি। ভোর হতেই হোটেলের সংলগ্ন ব্যালকনি দিয়ে টাইগার হিলের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের মাঝে সূর্যোদয় দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। শীতবস্ত্র জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি ম্যালে, ওখানে পর্যটকদের ভিড়, দর্শনীয় বস্তুগুলির দর্শন অভিলাষে সকলের সমাবেশ, জু দেখতে উঠি পাহাড়ের সিঁড়ি কেটে, পরে মিউজিয়াম, তেনজিং-এর মাউন্টেরিয়ানে ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করি। যেখানে এডমন্ড হিলারী, তেনজিং নোরগে এবং আরও পর্বত আরোহণকারীদের এভারেস্ট বিজয়ের পতাকা উত্তোলন শোভিত হচ্ছে। এরপর চলে যাই জাপানিজ প্যাগোডা, বুদ্ধমন্দির দেখতে।

বিস্তৃত টি-গার্ডেনে স্থানীয় নেপালী কাঞ্ছীদের পোশাক পরে থাকা অনেকের ফটো ক্যামেরায় বন্দী করে নিই। দার্জিলিং-এ তিনরাত্রি অনুষ্ঠানের মধ্যে একদিন গিদ্দা পাহাড়ের উচ্চ শিখরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোসের সাদা কাঁচের বাংলোটির স্মৃতি দর্শন করতে আমরা ভুলিনি। ফেরার পথে পাহাড়ের গা বেয়ে কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি ঝোরো, সিপাহী ঝোরার (ঝরনা) উত্তেজিত আকর্ষণ আমাদের কাছে টেনে সারা শরীর সিক্ত শীতল করে দেয়। শুনেছি কখনও কখনও বাঘ ওই সব ঝরনায় জল খেতে আসে।

তিনদিন পর জীপ ভাড়া করে ছুটে চললাম গ্যাংটক অভিমুখে, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে নীচে সমানে তালে তিস্তা নদীর র‍্যাট রেস দেখার মতো। সবুজ বনানীর ঘেরা টোপে পাহাড়ের আস্তরণ ভেদ করে গ্যাংটকে যাবার সময় মিলিটারীদের ক্যাম্প, দেবতাদের নানান প্রকার মন্দির দৃষ্টিগোচর হল। নেপালীদের সরাইখানায় গরম দার্জিলিং টি, চাউমিন খেয়ে ভাড়া করা গামবুট, গ্লাভস, টুপি পরে ছাঙ্গু লেকের পাশে

দার্জিলিং-এর ঝরনার এক অপরূ

উপনীত হলাম। বিশাল হ্রদ বরফে আচ্ছন্ন, পাশ দিয়ে উঠে গেছে বিখ্যাত ছাঙ্গু পাহাড়, যা সম্পূর্ণ বরফাবৃত। লাইন দিয়ে অপেক্ষমান (ইয়াক) চমরী গাইতে চড়ে পাহাড়ের পাদপীঠে উপস্থিত হলাম। অতিকষ্টে বারংবার ফিসলে যাওয়ার অর্চাম্ভিকতাকে

প্রবন্ধ

মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর

পরিব্রাজক হয়ে পথে বেরিয়েছেন গৈরিক বসনধারী এক উদাসীন যুবক। সর্বদা বৈষ্ণব সাহচর্যে ও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণে তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছে বৈরাগ্য। পদব্রজে কয়েকজন বৈষ্ণবের সঙ্গে এই যুবক গেলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। পরিভ্রমণ শেষে আবার চলে আসলেন, হুগলীর খানাকুল কৃষ্ণনগর। আশ্রয় নিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ অভিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দিরে।

যুবক সেই চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন মঙ্গলঘাট পরগণার তাজপুরের কাছে সারদা গ্রামে কেশরকুণী আচার্য বংশীয় এক মনোরমা কন্যাকে। ঘটনাক্রমে এই খানাকুল কৃষ্ণনগরেই এই যুবকের শ্যালিকার বিবাহ হয়েছিল। যুবক গোপীনাথ মন্দিরে মনোহরশাহী সংকীর্তন মন দিয়ে শুনছিলেন। যুবকের সঙ্গী ভৃত্য রঘুনাথ গোপনে শ্যালিকালয়ে সব খবর জানাল। শ্যালিকাপতি ভট্টাচার্য মশায় এসে সন্ন্যাসীকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। যুবককে কথার মারপ্যাঁচে গৈরিক ত্যাগ করিয়ে কয়েকদিন পর শ্বশুর নরোত্তম আচার্যের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সুদীর্ঘকাল পরে মিলন হল স্বামী-স্ত্রীর।

আমরা বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক উজ্জ্বল রত্নকে ফিরে পেলাম, ঘটনাক্রমে। এই যুবক আর কেউ নন, প্রসিদ্ধ কবি রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র।

ভারতচন্দ্র টাকা উপার্জন করবার মানসে এসে আশ্রয় নিলেন চন্দননগরের ফরাসডাঙায়।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে টাকা ধারের জন্য আসতেন ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ি। ইন্দ্রনারায়ণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে বললেন এবং তাঁর প্রতিভা, বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিলেন। শুরু হল ভারতচন্দ্রের জীবনে নতুন অধ্যায়। বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র পরম সমাদর করে ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে গেলেন। দিলেন মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাকবি পদে ভারতচন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন। ক্রমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গুণে মুগ্ধ হন। তাঁকে উপাধি দেন রায়গুণাকর। ১৭৪৯ খ্রীঃ একটি দলিলে (নদীয়া কালেক্টরী তায়দাদ নং ২০৩৩৭) ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে এই উপাধির উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ‘অন্নদামঙ্গল’ ও ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনায় উৎসাহিত করেন। এদুটি গ্রন্থ পাঠ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এত খুশী হন যে ভারতচন্দ্রকে বাড়ি নির্মাণ করতে তৎকালীন একশ টাকা ও বার্ষিক ছয়শত টাকা নামমাত্র মূল্যে মূলাজোড় গ্রামখানির ইজারা দেন।

ভারতচন্দ্র তৎকালীন বর্ধমান প্রদেশের বর্তমানে হাওড়া জেলার পান্ডুয়া, পেঁড়ো বা পেঁড়ো বসন্তপুর বা রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৭১২ খ্রীঃ (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত)। ভারতচন্দ্র ছিলেন পিতার চতুর্থ সন্তান বা ছোট ছেলে। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। এঁরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়। বড় জমিদার নরেন্দ্র-নারায়ণের আয় ছিল বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব হিসাবে। কিন্তু ধনী পরিবারে ভারতচন্দ্রের শৈশব আনন্দে কাটালেও বর্ধমানের মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে মত বিরোধে নরেন্দ্রনারায়ণ সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে পালান। নওয়াপুর মাতুলালয়ে ভারতচন্দ্রের আশ্রয় লাভ ও নিকটবর্তী তাজপুরের গ্রামের টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা লাভ।

রাজদুলাল ভারতচন্দ্র হঠাৎ করে দৈন্যদশার মধ্যে পড়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে শিখলেন। ইতিমধ্যে ১৪ বছর বয়সে বিবাহ। নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ধমান মহারাণীর আনুকূল্যে আবার পেঁড়ো গ্রামে বসবাস করতে লাগলেন। সংস্কৃত শিক্ষা শেষ করে ভারতচন্দ্র গৃহে ফিরে আসলেন। কিন্তু দাদারা গঞ্জনা দিতে শুরু করলেন ছোটো ঘরে বিয়ে এবং তৎকালীন রাজভাষা ফারসী শিক্ষা না করে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। ভারতচন্দ্র মনোদুঃখে অভিমান করে গৃহত্যাগ করলেন। হুগলী জেলার দেবানন্দপুরের মুন্সীরা বিশেষ সম্পন্নলোক, কায়স্থ। এখানে ভারতচন্দ্র আশ্রয় লাভ করে। গৃহস্বামী রামচন্দ্র মুন্সীর যত্নে ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। রাজদুলাল ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্র কায়স্থ গৃহস্বামীর কাছ হতে সিধা পেয়ে নিজের হাতে রেঁধে খেতেন।

এই সময় থেকেই কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ হল তাঁর। মুন্সী বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজার ব্রত কথা বলবার সময় স্বরচিত ব্রতকথা পাঠ করে সবাইকে চমৎকৃত করেন।

দেবানন্দপুরে পাঁচ বছর কাটিয়ে ফারসী ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করে বিশ বছর বয়সে বাড়ি ফিরলেন। বর্ধমান রাজার সঙ্গে খাজনা নিয়ে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের গোলযোগ হওয়ায় ভারতচন্দ্র বর্ধমানে গিয়ে রাজাকে বুঝিয়ে শান্ত করলেও গোলমাল আবার বাধল। ভারতচন্দ্র রাজরোষে পড়ে কারাগারে গেলেন। তবে কারাধ্যক্ষের কৃপায় শীঘ্র মুক্তি পেয়ে ভৃত্য রঘুনাথ সহ গেলেন পুরী। পথে কটকে মহারাষ্ট্র সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহ লাভ করে পুরীতে বাস করার অনুমতি পান সভৃত্য বিনা-করে। সকল মঠেই সসম্মানে তিনি শিবভট্টের ইচ্ছায় স্থান পাবেন। ভরণপোষণের জন্য একখানি বলরামী আটকে প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট হল। রইলেন পুরীর শঙ্করাচার্য মঠে।

১৭৫২ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের মহৎসৃষ্টি অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর বা ‘কালিকামঙ্গল’। ১৭৫৭ খ্রীঃ হয় পলাশীর যুদ্ধ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সিরাজদ্দৌল্লার বিপক্ষে ও রবার্ট ক্লাইভের পক্ষে ষড়যন্ত্রকারী। তবে কৃষ্ণচন্দ্র ধনশালী রাজা ও সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজপতি, যিনি বিবাহ ও জাতিগত প্রথা নির্ধারণ করতেন। সম্ভ্রান্ত সৎ হিন্দু, গরিব আত্মীয়স্বজনদের নিজের পরিবারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। যাঁরা গুণী তাঁদের সাদরে স্থান দিতেন রাজসভায়। রাজসভা ছিল কৃষ্টি ও রুচিশীল। এই সভ্যতার ধারা সর্বভারতীয় এবং এই সংস্কৃতি বাংলার গ্রাম জীবনের ধারা ও পথকে করেছিল প্রশস্ত। তাঁর রাজত্বের নিজস্ব পতাকা ও সঙ্গীত ছিল। রাজছত্র, রাজদণ্ড চমরের তৈরি চামর, ময়ূরের পালকে তৈরি ব্যজন, একটি বিশিষ্ট মূল্যবান পাগড়ী ছিল তাঁর ব্যবহারের বস্তু, বাসস্থান পরিখা পরিবেষ্টিত ও সুমণ্ডিত। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ছিলেন মহান শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন, নীলমণি দিন গোস্বামী! রাজসভায় দলবল নিয়ে অন্নদামঙ্গল কাব্যখানি সুর করে গাইতেন। এসবই ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে আমরা পাই, সমসাময়িক চিত্র হিসাবে। ভারতচন্দ্র পুরাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মতো আদর্শবান। হিন্দু দর্শন ও হিন্দু বিজ্ঞানের, সংস্কৃত সাহিত্যের কৃষ্টিকে নির্ভর করে তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিলেন। উচ্চ চিন্তাশক্তি, বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিকতা বোধ তাঁর সাহিত্যে যুক্ত। পরিমার্জিত তিনি, মাঝে মাঝে অবশ্য রাজসভার মোটা দাগের রুচির মতো কবিতা

সাহিত্যের পাতা

লেখেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও অভিজাত দৈত জীবনবোধে উদ্দীপ্ত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তিনি মুসলিম ও রাজপুত জীবনের অনুকরণ করছেন দিল্লী-আগ্রার মতো, কিন্তু অন্তরঙ্গে তিনি চিন্তায় ও জীবনধারণে পুরাতনী মূল্যবোধের অনুগামী, ধার্মিক মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ তিনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় চিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই — এমন সমগ্র সত্তা দিয়ে তৎকালীন যুগ চিত্র কেউ আঁকতে পারেননি। এদিক থেকে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী ও চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উত্তর সূরী। ভারতচন্দ্রকে না জানলে অষ্টাদশ শতকের বাঙলার সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের পরিচয় থাকবে অসম্পূর্ণ।

ভারতচন্দ্রের ছিল আধুনিক মন। দেবতাকে করেছেন তিনি মানব। ‘ঈশ্বরী পাটনী’ মাঝি ক্লাসিক চরিত্র, বাঙালির চিরন্তন কামনাকে করেছে প্রতিধ্বনিত ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।’

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্রকে মুকুন্দের বিশেষ অনুকারক বলেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দালঙ্কার বা ‘ধ্বন্যুক্তি’ তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা।

ছলছ্ছল টলটল কলক্কল তরঙ্গা।।

শব্দের দ্বারা চিত্রনির্মাণে তিনি নিপুণ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গ সরস্বতী তন্বীশ্যামা শিখর দশনা রূপ লাভ করেছে প্রসাদগুণ ও রসালতা নিয়ে। আদিরসও প্রচুর। কিন্তু তিনি তা উপমা অলংকার ও সাধু ভাষায় আবৃত করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতার মধ্যেও আর্ট আছে। সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, বৈষ্ণব সাহিত্য ও নাগরিক সভ্যতা কবিকে বুদ্ধি দীপ্ত ও পরিমার্জিত করেছে। তেমনিও তাঁকে রতিরস ও রঙ্গরসের কবিতে পরিণত করেছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণবকাব্য শৃঙ্গার রসের কৌস্তভমণি। সমসাময়িক নাগরিক রুচি দ্বারা পরিপুষ্ট, নাগরিক জীবনের বিকৃতি, পঙ্কিলতা, কলুষ—মানব মনের অবক্ষয় জনিত ভোগসর্বস্বতা ও নীতিহীনতার সঙ্গে মিশেছে কবির রঙ্গপ্রিয়তা। তুলনাহীন প্রসাদগুণ, রতিরসের বাণীমূর্তি ও হাস্য পরিহাসের শ্বেতশুভ্র দ্যুতি সব মিলিয়ে একটি ক্ল্যাসিকাল মনোভঙ্গী কবির কাব্যভাবনা ও প্রকাশভঙ্গিকে করেছে নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে আমরা পাই ভারতচন্দ্রের মধ্যে অপূর্ব কথা রস নিপুণতা। তাই বীরবল প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে ‘[illegible]’ বলেছেন। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো কলাবিদ বা সাহিত্য কলার প্রয়োগশিল্পী কেউ ছিলেন না।

কবি শৈব-বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি ধর্মবিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন শুধু করেননি, বেদের কর্মকান্ডের সঙ্গে জ্ঞানকান্ডের, সাকারতত্ত্বের সঙ্গে নিরাকারতত্ত্বের, পুরাণ, বেদান্ত, সাংখ্য বিবিধ শাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করেছেন। ভারতচন্দ্র ‘অন্নদামঙ্গল’ আদ্যাশক্তি হতে হরিহর ব্রহ্মার উৎপত্তি ও ত্রিগুণাত্মিকা পরমাশক্তির সত্ত্ব, রজঃ ও তম-এই তিন পৃথক পৃথক গুণের যে এক একজন প্রতীক — মূলে যে তাঁরা ভেদহীন—গ্রন্থারম্ভেই তা বলেছেন। কবি নিজে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন। জ্ঞানমার্গে সিদ্ধি লাভ করলে সাংসারিক আধি-ব্যাধি বিদূরিত হয়ে মন নিত্যানন্দে অধিষ্ঠিত হয়, এটি তিনি যেমন জানতেন, তেমনি উপলব্ধি করতেন কর্ম সাধনার

(এরপর ১৫ পাতায়)

ভিযান

কাটিয়ে বরফ হাতড়ে হাতড়ে পাহাড়ের মধ্যস্থলে গিয়ে ওই বরফের মধ্যে বসেই হাঁফিয়ে উঠলাম। ওই বরফিলী ঠান্ডার মধ্যে একে অন্যকে বরফ ছুঁড়ে মারার মজার খেলার কোনও খামতি ছিল না। সন্ধ্যের পূর্বেই অতি

ং-এর ঝরনার এক অপরূপ দৃশ্য।

সন্তর্পণে পাহাড় থেকে নেমে পূর্ব নির্দিষ্ট হোটেলে ফ্রেশ হয়ে কফি স্ন্যাকস খেলাম।

পরেরদিন ভোর ৪টের সময় হোটেলের গ্যালারি দিয়ে অদূরে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের ধবল চূড়ার দর্শনে জীবন ধন্য হয়ে গেল। সূর্যের রূপোলী আলোয় ঝলমলে হিমালয়ের শ্বেতশুভ্র প্রাকৃতিক অনাবিল সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। কত সুখ-দুঃখের সংমিশ্রিত ইতিহাসের সাক্ষ্য। হিমালয়ের কিঞ্চিত দর্শনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। ধন্য এডমন্ড হিলারী, তেনজিং নোরগে এবং আরও অনেকে যাঁরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ‘এভারেস্টে’ স্বদেশের ফ্ল্যাগ উত্তোলনে সক্ষম হয়েছেন। আবার অনেকে দুর্ভাগ্যবশত হিমালয়ের প্রবল তুষার ঝড়ে বরফের আস্তরণের নীচে সলিল সমাধিস্থ হয়েছেন। ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ -গানের কলি গুনগুনিয়ে সেদিনই শিলিগুড়ি যাত্রা করলাম কলকাতা ফেরার উদ্দেশ্যে। যাতায়াত ব্যবস্থা ধর্মতলার ট্যুরিস্ট বাস গুমটি থেকে ভিডিও কোচ লাক্সারি বাসে সারা রাত জার্নির পর শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌছোনো। ওখান থেকে ট্যাক্সি, বাস, জীপ। প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা আছে দার্জিলিং স্টেশন পর্যন্ত। ভাড়া ন্যায্য এবং ফিক্সডই থাকে।

দার্জিলিং-এ ছোট হোটেল, ট্যুরিস্ট লজ, গেস্ট হাউস সুলভে পাওয়া যায়, যদিও গরমের সিজনে পর্যটকদের ভিড়ে জায়গা পাওয়া মুস্কিল হয়ে ওঠে, যদি না আগে থেকে বুকিং করা হয়। সাইট সিন দেখাবার জন্যও বাস। গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। দার্জিলিং স্টেশন থেকেই জীপ ট্যাক্সি গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে সঠিকমূল্যে ভাড়া পাওয়া যায়।

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853

Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

হিন্দু সন্ত্রাসের ধুয়ো

গত ১৭ নভেম্বর-এর স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় 'হিন্দুদেরকে সন্ত্রাসবাদী ছাপ!' যথার্থ ও বলিষ্ঠ। অন্যান্য বাজার চলতি পত্রিকার তুলনায় স্বস্তিকার পর্যবেক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্য প্রশংসনীয়।

অসুস্থ, নৈতিকতাহীন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে, সীমান্তের ওপারের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় সমগ্র দেশজুড়ে সন্ত্রাসের কালান্তক প্রতিঘাত প্রায় তিনদশক ধরে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থব্যবস্থাকে নাস্তানাবুদ করে চলেছে। সম্প্রতি অসম ও ত্রিপুরায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় একশো মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। আহত হয়েছেন কয়েকশো। নিরীহ মানুষ হত্যার এই ধারাবাহিকতার পেছনে যে হিংসা ও বিদ্বেষের সিদ্ধান্ত কাজ করছে এর প্রকৃত স্বরূপটিকে আমাদের চিনে নেওয়া প্রয়োজন।

সন্ত্রাস কি কোনও বাদ (ইজম) বা মতাদর্শ? হয়তো নয়। কিন্তু মতবাদকে টিকিয়ে রাখা, আধিপত্য বিস্তার ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে অনুসারীগণ অঘোষিত যুদ্ধাভিযানের অঙ্গ হিসেবে শাসনতন্ত্র ও জন মনে ত্রাস সঞ্চার করার লক্ষ্যে যুদ্ধনীতির অভিন্ন কৌশল হিসেবে সন্ত্রাসকে ব্যবহার করে থাকে, ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে।

নেপালে মাওবাদী আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়া সন্ত্রাসের ঘৃণ্য পথ ধরেই ঘটেছিল। মার্কসবাদে ওয়ার অব পজিশন (মগজ দখলের লড়াই) এবং ওয়ার অব ম্যানয়ুভার। সতর্ক সৈনিকঢাল শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের একটি রণনীতি। সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক আক্রমণ রণনীতির যেমন একটি দিক, তেমনি গেরিলা যুদ্ধে ত্রাস সঞ্চার করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া একটি অভিন্ন কার্যক্রম আঠারো শতকে ফ্রান্সের বিপ্লবে ঘটেছিল। লেনিন-স্ট্যালিন-মাও জমানায় ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া হিসেবে এই ঘৃণ্য সন্ত্রাসকেই হাতিয়ার করা হয়েছিল।

ইদানীং কালে, এ ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই দেখা যায় পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক শিবির উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সমস্যা তার স্থানে অটল থাকে। ক্ষমতা লোভীদের কাছেই ভি এম নামক ম্যাজিক বাক্সটি অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু। বাক্সটিকে কব্জায় আনতে এরা দেশের স্বার্থকেও বিড়ম্বিত করতে ছাড়ে না। দেশপ্রেমীদেরও দেশদ্রোহী বানিয়ে ছাড়ে। এই নোংরামোর সুযোগ নিয়ে দেশবিরোধী শক্তি সশব্দ ও নিঃশব্দ আগ্রাসন চালিয়ে যায়। প্রকৃত সন্ত্রাসীরা নিরীহ মানুষ হত্যা করেও পেয়ে যায় সেফ প্যাসেজ। জিহাদ ও সন্ত্রাসের সমীকরণ সম্প্রতি ইসলামি তাত্ত্বিকদেরও ভাবিয়ে তুলছে। জিহাদ ও সন্ত্রাস দুটো আলাদা বিষয় এটি প্রমাণ করতে সমগ্র বিশ্বের ইসলামি গবেষকগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইসলামি গবেষকগণ জিহাদকে গঠনমূলক বিষয় এবং প্রত্যেক মানুষের জিহাদ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে বলে দাবি করেন। অন্যদিকে সন্ত্রাসকে ধ্বংসাত্মক বলে মত প্রকাশ করেন। ইসলামি শাস্ত্র মতে হয়তো এটা ঠিক। আরবি ভাষা জ্ঞান যেহেতু অধিকাংশ ভারতবাসীর মোটেই নেই সুতরাং গবেষকদের উপর আমরা ভরসা রাখি।

জিহাদী সন্ত্রাসকে চাপা দিতে এখন হিন্দু সন্ত্রাসের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। ভারতের বর্তমান কালের জঘন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মেকানিজমের দিকে মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় হাজার বছর ধরে হামলাবাজদের গোলামি হিন্দুরা কেন খেটেছিল। আসলে অনেক হিন্দুর অতীত চরিত্র বলে কিছু ছিল না, আজও নেই। এদের খুব সহজেই কেনা যায়, এটাই হিন্দুর প্রধান দুর্বলতা। হিন্দু আগ্রাসী নয় এটি হিন্দুর মহানুভবতা। কিন্তু কাপুরুষের মতো সব কিছু মেনে নেওয়া আর কতো দিন, একটু ভাবুন।

শিবপ্রসাদ লোধ, নর্থ লামডিং, নগাঁও, অসম।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন

সম্প্রতি পাঁচটি রাজ্য — মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান,দিল্লী ও মিজোরামের নির্বাচন হয়ে গেল এবং তার ফলও আমাদের সকলের জানা। কিন্তু একটা জিনিস এই নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতিটি দেশবাসীর চোখে পড়েছে, তা হচ্ছে ভোটের ফলাফল প্রকাশে বৈদ্যুতিন মাধ্যম, বিশেষ করে বাংলা চ্যানেলগুলো এবং বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা। হ্যাঁ, ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতে না হতেই এইসব চ্যানেলগুলো এবং পরদিন বাংলা সংবাদপত্র সকলের ফল প্রকাশ, বিশ্লেষণে এমন একটি চিত্র উপস্থাপন করল যে, বিজেপি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের জয় জয়কার। একটি সংবাদপত্র তো বড় বড় করে লিখে দিল বিজেপি একটি প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমের এই ধরনের এক পেশে বিবরণ, প্রচারে নিরপেক্ষতা বর্জন সত্যিই দুঃখজনক এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝতে মোটেই সহায়ক নয়! পাঁচ রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল এবং দিল্লী ও মিজোরামে বিরোধী দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ক্ষমতায় থাকা রাজ্যে এবং সেই সঙ্গে বিপরীত দুটি প্রদেশে নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিজেপিকে লড়াই করতে হয়েছিল। সেখানে দুটি রাজ্যে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে, আরেকটি রাজ্যে কিছু সংখ্যক আসনের অভাবে ক্ষমতা হারানো, অপরটিতে বিরোধী শক্তি হিসেবে এগিয়ে যাওয়া, আর শেষেরটি আসন লাভে অসমর্থ হলেও ভোটের তারতম্য সামান্যই।

এবারের পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির বিরাট সাফল্য। দুঃখের বিষয় বাংলা বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সংবাদপত্রসমূহ বিজেপির এই সাফল্যের দিকটির ওপর সামান্য আলোকপাত করেনি! একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে লক্ষ্য করেছি এইসকল বাংলা প্রচার মাধ্যম বিজেপি-র প্রসঙ্গ এলেই যেন 'কেমন' হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান ছাড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে বলতে ও লিখতে 'আত্মশ্লাঘা' বোধ করে! এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই সব মাধ্যম পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করেছে বললে বেশি বলা হবে না!

অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বসুমতী' এবং 'যুগান্তরের' সাংবাদিকতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এদের ছিঁটেফোটাও এখনকার এই প্রচার ও প্রকাশ মাধ্যমগুলোতে দেখা যায় না!

সাংবাদিকতা আজ উদ্দেশ্যমূলক। সত্যের প্রকাশ সেখানে দেখা যায় না। বলতে গেলে সাংবাদিকতা আজ নিম্নগামী। অর্থ ও বাণিজ্যের অভিমুখে।

তবে একটা জিনিস স্বীকার করা ভাল ও সঙ্গত। যে দ্রুতগতিতে বিজেপি জাতীয় রাজনীতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে এই নির্বাচনের ফলে সাময়িক বাধা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই মেঘ কেটে যাবে। বলিষ্ঠ ও সৎ নেতৃত্বের গুণে স্বমহিমায় কিছু দিনের মধ্যে বিজেপি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জাতির অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হতাশার কোনও কারণ নেই!

রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৭০০০৩৬

বক্তব্য রাখছেন বিশ্বনাথ মুখার্জী। পাশে দিলীপ আঢ্য।

বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সমাজ সেবাভারতী (দঃবঃ) অনুমোদিত দুর্গাপুর বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ১৩ নভেম্বর ইছাপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম, গ্রাম পরিক্রমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। এছাড়াও পুরস্কার বিতরণ, শংসাপত্র প্রদানসহ এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনারও ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কার্যক্রম হিসাবে এবার ইচ্ছাপুর গ্রামের কৃতিছাত্র এবং বর্তমান দুর্গাপুরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভাকর মন্ডলকে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক দিলীপ আঢ্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর প্রণবানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ দে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ভরত ভূষণ, ভারত বিকাশ পরিষদের গোপাল খৈতান সহ আরও অনেকে।

ভারত বিকাশ পরিষদের বিকলাঙ্গ পরীক্ষা শিবির

দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি বা জন্মগত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের নিঃশুল্ক শারীরিক পরীক্ষা এবং পরবর্তী পরিস্থিতির বিবেচনাসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং কৃত্রিম অঙ্গ প্রদানের উদ্দেশ্যে আগামী ৪ জানুয়ারি সকাল দশটায় এক শিবির করতে চলেছে ভারত বিকাশ পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এবং কলকাতা মারোয়াড়ী মহিলা সমিতি।

সংস্থার সূত্র অনুযায়ী, এই দুই সংস্থার উদ্যোগে মানিকতলা মেইন রোড-এর কাছে কাকুঁড়গাছি বড়ো পার্ক সংলগ্ন নিউ হরিয়াণা ভবনে শিবির অনুষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত ভারত বিকাশ পরিষদ প্রতিবছরই এই ধরনের শিবির করে থাকে।

সূর্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি সম্পন্ন হল প্রায় এক হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নবীন যুবকদের দেশভক্তি, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম, বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানির বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ মদনদাসজী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রদ্যুৎ ও সুরভি রায়-এর বিবাহ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি তুলে দেওয়া হচ্ছে দুর্গাপুর নগর সঙঘচালক দেবাশীষ লাহিড়ির হাতে।

মঙ্গলনিধি

বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যয়ের সামান্য অংশ বাঁচিয়ে সামাজিক কাজে ব্যবহারের জন্য মঙ্গলনিধি প্রদানের কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে সম্পন্ন হল। উত্তর মালদা (চাঁচল) জেলার মালতীপুর খন্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম সরকারের বিবাহে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে প্রদান করা হয়।

বর্ধমানের ভাটাকুল গ্রামের স্বয়ংসেবক গৌরাঙ্গ গোস্বামীর বিবাহ উপলক্ষে ১০০০টাকা মঙ্গলনিধি বাবদ দেওয়া হয়।

ভাটাকুল গ্রামের স্বয়ংসেবক আনন্দ রায় তাঁর বিবাহ উপলক্ষে১০০১ টাকা মঙ্গলনিধি দেন। বর্ধমান -এর হীরাগাছি গ্রামের স্বয়ংসেবক সঞ্জীব দত্ত তাঁর ভাইয়ের বিয়েতে ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে প্রদান করেন।

মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধানিধি

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা শেখর রঞ্জন সিংহের মাতৃবিয়োগের এক বর্ষপূর্ণ হয় গত ৪ ডিসেম্বর। এইদিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যাকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে জেলা সঙঘচালক চন্দন কান্তি ভুঁঞার হাতে দু' হাজার টাকা মাতার স্মৃতিতে সমাজের কাজের জন্য শেখরদা তুলে দেন।

গীতায় কর্ম করার উপদেশ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান কর্ম ত্যাগের উপদেশ করেননি, উপদেশ করেছেন কর্ম করার। ভগবান অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি নিয়মিত ভাবে কর্ম করে যাও, 'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মনঃ'— কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। শুধু তাই নয়, কর্মহীন হলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না। মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করার জন্য শ্রীভগবানের যে উদাত্ত আহ্বান তা আজ পাঁচ হাজার বছর ধরে বিশ্ববাসীকে প্রেরণা জুগিয়ে আসছে। পদ্মের এক একটি পাপড়িকে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করলে যেমন পরিশেষে সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রস্ফুটিত পুষ্পটি নয়ন গোচর হয়, হৃদয় ভরে ওঠে অপার আনন্দে; তেমনই শ্রীভগবান গীতায় অপূর্ব বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কর্মের রহস্যটি উন্মোচিত করেছেন সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন —

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়াথান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।। ৩/৬

— যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ, বাক্য, উপস্থ ও পায়ু প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অর্থাৎ কর্মের মধ্যে যুক্ত না করে মনে মনে গ্রহণ, গমন বা শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণপূর্বক অবস্থান করেন তাঁকে মিথ্যাচারী বলা হয়। যাঁরা কর্মযোগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবশত অথবা অলস প্রকৃতির জন্য হস্তপদাদির দ্বারা কোনও কর্ম না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন অথচ ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মনে মনে স্মরণ করেন বা ভোগ করেন তাঁদের বিশেষভাবে ভগবান নিন্দা করেছেন। ভগবান তাঁদের তিরস্কার করে বিশেষরূপে মূঢ় বলেছেন, আবার মিথ্যাচারী বলেছেন। কর্মেন্দ্রিয়গুলির ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে শরীরের মধ্যে তাদের অবস্থানের সার্থকতা।

কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কীভাবে কর্ম করতে হবে সেই রহস্যটি অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভগবান বলেছেন — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্ম করতে হবে (গী ৩/৭)। জ্ঞানেন্দ্রিয়র কাজ বিষয় গ্রহণ, আর কর্মেন্দ্রিয়র কাজ কর্ম করা। এই দু-প্রকার ইন্দ্রিয়রই জীবনে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। চক্ষু রূপ দর্শন করে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যাদির রস আস্বাদন করে, ত্বক স্পর্শ সুখ অনুভব করে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ভোগ করে থাকি। জগতে যত প্রকার বিষয় আছে ভোগ করে থাকি। জগতে যত প্রকার বিষয় আছে তা ওই পাঁচটির মধ্যে বিধৃত আছে। তাই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যদি সংযত করা না যায়, তা হলে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যত শুভ কাজই করা হোক না কেন তা পরিণামে জীবনকে পূর্ণ

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

করবে না। সংযমের অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে কল্যাণের পথে ঈশ্বরীয় পথে পরিচালিত করা। দেখতে হবে চোখ যেন স্নিগ্ধ সুন্দর মঙ্গলময় রূপ দর্শন করে, কান যেন ভগবৎ বিষয়ক, সমাজকল্যাণমূলক শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা যেন স্নিগ্ধ প্রাণমাতানো মিষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা যেন সাত্ত্বিক আহার করে, ভগবানের প্রসাদাদি গ্রহণ করে এবং ত্বক যেন মনের আনন্দবর্ধক কোমল স্পর্শ অনুভব করে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত হলে মন ও বুদ্ধি মার্জিত হয়, তখন সেই মার্জিত মন-বুদ্ধি দ্বারা কোনও অন্যায় কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই ভগবান বললেন, জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে তুমি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত কার্য নির্বাহ কর। এই কার্যও অনাসক্ত হয়ে করতে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় কর্ম ত্যাগের কথা যেমন ভগবান বলেননি তেমনই আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার কথা বলেছেন। আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করা তখনই সম্ভব যদি ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করা হয়। ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে কর্ম করছি, ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই কর্ম করছি এবং কর্মের ভালমন্দ ফল ঈশ্বরকেই অর্পণ করতে হবে। এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে কর্মের দ্বারা কোনও বন্ধন হয় না। তাই ভগবান বললেন, 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ (৩/৯) —যজ্ঞের জন্য বা ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। স্মৃতিতেও আছে—কর্মনা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতিঃ—কর্ম দ্বারা প্রাণী বদ্ধ হয়। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ—বিষ্ণুই যজ্ঞ স্বরূপ। তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সেটি যজ্ঞ হয়ে যায়, তখন সেই কর্ম বা কর্মফল আর আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না।

'শিবমানসপূজন' স্তোত্রে বলা হয়েছে—

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ববাগিরো।

যদ্ যদ্ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।।

—হে শম্ভো, আমার পদসঞ্চারণ ভ্রমণাদি যেন তোমাকে প্রদক্ষিণ করা, আমার সকল বাক্যই তোমার যেন স্তোত্রাবলী এবং যা যা কাজ করি সবই তোমার আরাধনা। সাধক রামপ্রসাদের গানে আছে—'আহার করি যেন আহুতি দিই শ্যামা মাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে হবে। কীভাবে করতে হবে? পদ্ধতি কি? ভগবান বললেন—'তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' (৩/৯)—হে কৌন্তেয়, কর্ম সম্যগরূপে অনুষ্ঠান কর (কর্ম সমাচর), কিন্তু 'তদর্থং' তাঁর নিমিত্ত বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মের অনুষ্ঠান কর এবং 'মুক্ত সঙ্গঃ'—কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠান কর। দুটি শব্দ ভগবান ব্যবহার করেছেন—তদর্থ এবং মুক্তসঙ্গঃ। কর্মযোগ সাধনার মূল রহস্যটি যেন ওই দুটি শব্দের মধ্যে দিয়ে ভগবান তুলে ধরেছেন। কর্ম যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় এবং কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে করা হয় তাহলে তা বন্ধনের কারণ হবে—আসা-যাওয়ার চক্র কোনওদিনই বন্ধ হবে না, আর যদি সেই একই কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং আসক্তিশূন্য হয়ে করা হয় তাহলে তা জীবের মুক্তির কারণ হয়। এইরূপভাবে কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হলে স্বরূপানুভূতি হয়। আর স্বরূপানুভূতি হলে মুক্তি হয় করতলগত।

যমুনায় উত্তাল তরঙ্গ, গোপীরা যমুনা পার হয়ে মথুরার হাটে যাবেন। ব্যাসদেব যমুনার তীরে অবস্থান করছিলেন। গোপীরা তাঁর কাছে যমুনাকে শান্ত করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। ব্যাসদেব বললেন, এখন আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, তাই আগে খাবার দাও পরে কথা হবে। গোপীরা প্রচুর ক্ষীর ননী খাওয়ালেন। তখন ব্যাসদেব যমুনার কাছে গিয়ে বললেন, হে যমুনে, আমি আজ যদি কিছু না আহার করে থাকি তাহলে তোমার জল শান্ত হয়ে যাক। যমুনা শান্তরূপ ধারণ করল। গোপীরা তো অবাক! বললেন — ঠাকুর, তুমি এত ক্ষীর ননী খেলে আর বললে যে, কিছুই খাওনি। ব্যাসদেব বললেন, সত্যিই তো আমি কিছু খাইনি, আহার করেছেন তো বৈশ্বানর — অগ্নিরূপে যিনি দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন তিনি। ব্যাসদেবের এই উদাহরণ সামান্য আহাররূপ ক্রিয়াটিও কীভাবে সমর্পণ করতে হয় তার অপূর্ব শিক্ষা। আশ্রম, মঠে সাধু-সন্ন্যাসীরা দেখা যায় সংসারী মানুষের থেকেও বেশি কাজ করেন। সমাজকল্যাণ মূলক এবং আশ্রম পরিচালনার জন্য বহু কাজই তাঁদের করাত হয়। অর্থ সংগ্রহ, জাগতিক বস্তু সংগ্রহ এবং গৃহাদি নির্মাণ প্রভৃতি সব কিছুই করতে হয়। কিন্তু তাঁরা অর্থ সংগ্রহ থেকে গৃহাদি নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত কাজই শ্রীগুরুদেবের কাজ, ভগবানের কাজ হিসাবেই করেন। সকল কাজকেই তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা বলে গ্রহণ করেন। সেই কর্ম তখন আর সাধারণ কর্ম থাকে না, তা হয়ে যায় কর্মযোগ। তাই ভগবান বললেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভি জানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।। ৪/১৪

কর্মসমূহ আমাকে স্পর্শ করে না, আমি নির্লিপ্তভাবে কর্ম করে যাই আর কর্মফলেও আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, এইভাবে যিনি আমাকে জানাতে পারেন তিনি কর্মসমূহের দ্বারা কখনই বদ্ধ হন না। অর্থাৎ ভগবান যেভাবে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন প্রভূত কর্ম করেও, আমাদের সেইভাবে অহংকার শূন্য হয়ে কর্ম করার অভ্যাস করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের জীবন যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে — পূজা-উপাসনা থেকে আরম্ভ করে রাজকার্য পরিচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা দেশ ও ধর্মরক্ষার কার্য পর্যন্ত প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁদের জীবন কেটেছে। আবার ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর, চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় সাধন ভজনের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার ও ধর্মরক্ষার কাজে তাঁরা করেছিলেন জীবন উৎসর্গ। প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা থাকতেন শান্ত সমাহিত। কর্মযোগের সাধনার জন্য তাই তাঁদের জীবন অনুধ্যান করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিচার এবং অভ্যাস। তাহলে আমরাও একদিন হয়তো উপলব্ধি করতে পারব প্রবল কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা।

ভগবান কী সত্যিই স্বীকার করেন ভক্তের প্রার্থনা

সোমনাথ নন্দী

সত্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতেচ-ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্হিতান্।।

(গীতা-৭।২২)

সঙ্কটটা সম্ভব হয়েছে কলিযুগ বলেই। একদিকে বিচারবুদ্ধির দৌর্বল্য, অন্যদিকে বিশ্বাস, নির্ভরতার ক্রমাবনতি। আসুরিক গুণে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে বর্তমান মনুষ্য সমাজের। সাথে যুক্ত হয়েছে এক অদ্ভুত ব্যাকরণবিধিহীন শব্দ — ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মভাবনার এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। যার ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে অলস, বিকৃতবুদ্ধি ঈশ্বরবোধহীন বিশাল সংখ্যক মানুষ আত্মতৃপ্তি অর্জনে। তাঁরা দেখেও দেখেন না, বুঝেও বোঝেন না, ঈশ্বর কতভাবে তাঁর শ্রদ্ধালু ভক্তদের কামনা পূর্ণ করছেন, তাঁদের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন।

পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সে কৃপাধারা যে অব্যাহত, বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সে প্রমাণ প্রত্যয় জাগায়। গীতায় তাঁর আশ্বাস নিতান্ত কথার কথা নয়।

প্রথম ঘটনার কাল আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর পূর্বের। আনুমানিক ১৬১০ খৃস্টাব্দ। বৃন্দাবনে মদনমোহন মন্দিরে এসেছেন নিষ্কিঞ্চন, বিবিক্ত বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বয়স তখন তাঁর আশি। শরীর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় প্রায় অশক্ত। ন্যুব্জ কম্পিত দেহে তিনি এসে দাঁড়ালেন বৃন্দাবন পুরন্দর মদনমোহন বিগ্রহের সামনে। হাতে স্বহস্তলিখিত পুঁথি —শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আজ্ঞা নিতে এসেছেন তিনি মদনমোহনের লীলাগ্রন্থটি জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য। পুঁথি কম্পিত হাতে বিগ্রহের পদতলে রাখা মাত্র বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হতে মালা বিচ্যুত হয়ে পড়ে যায় উক্ত পুঁথির ওপর। উল্লাসিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনেশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃপা লাভ করে। সেই লীলাগ্রন্থ এখন সারা বিশ্বে মহান বন্দনীয় পুস্তকের মর্যাদায় ভূষিত।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সাম্প্রতিক ২০০৮ সালের। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সুদূর রাজস্থানের যোধপুর থেকে এসেছেন প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত ৫৯ বছরের এক প্রৌঢ়। নাম মন্মল চিত্র। শরীরের বাঁদিক ছিল সম্পূর্ণ অবশ। কথা বলাও বন্ধ। চলৎশক্তিরহিত।

জগন্নাথদেবের অলৌকিক লীলার কথা শুনেছিলেন মন্মল। যোধপুরে থাকতেই তিনি আকুল প্রার্থনা জানাতেন নিজের আরোগ্য কামনায় অনন্যচিত্তে। তাঁর আকুতি গ্রহণ করেছিলেন কলির প্রত্যক্ষ বাসুদেব শ্রীজগন্নাথ।

আত্মীয়দের সাহায্যে মন্মল এলেন একদিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। ডানহাতে ক্র্যাচে ভর করে স্ত্রী ও দু-একজন আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি এলেন কোনক্রমে। আশা তিনি রোগমুক্ত হবেন জগন্নাথদেবের কৃপায়। গর্ভগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে মন্মল হঠাৎ অনুভব করলেন। তিনি কারও সাহায্য ছাড়া এমনকি ক্র্যাচ ব্যতিরেকে দাঁড়াতে পারছেন খাড়া হয়ে। নাড়তে পারছেন অবশ বাঁ হাত। দুচোখ তখন আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত তাঁর। প্রভু তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করেছেন। প্রায় ঘন্টাখানেক থাকার পর মন্মলের পায়ের গতিশক্তি ফিরে আসে। রুদ্ধ বাকশক্তি সবাক হয়ে ওঠে। তাঁর বোবা অবস্থা হতে যে কয়েকটি শব্দ উচ্চারিত হয়ে সবাক অবস্থা ফেরে, তা হল — মা সুভদ্রা, শ্রী জগন্নাথ ও শ্রীবলভদ্র। বাকশক্তি লাভ করে তিনি বলেন — বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি তিন বছর আগের সুস্থ অবস্থায় ফিরে গেছি। জগন্নাথ কৃপা ভিন্ন এ সম্ভব ছিল না। ঘটনাটি প্রকাশিত হয় ইসকন-র মুখপত্র "হরেকৃষ্ণ সমাচার" পত্রিকায় (৩১ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)।

শেষোক্ত ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজে। গত ১১ জুন (২০০৮) রিষড়া প্রেম মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর একটি পত্র নিয়ে পুরীতে যাই। পত্রটি লেখা শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশ্যে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের ৫০০ বছর উদযাপন উপলক্ষে বাংলার সমস্ত সাধু সমাজ "শ্রী চৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি" নামে যে সংগঠন গড়ে তুলেছেন, তার সাফল্য প্রার্থনা করে দেবানন্দজী অধ্যক্ষ হিসেবে

(এরপর ১২ পাতায়)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

নারী ও কল্যাণ শিক্ষাব্রতে সারদেশ্বরী আশ্রম

ইন্দিরা রায়

মা নামের সার্থক সংজ্ঞাই হলেন মা সারদাদেবী। শান্ত নিরীহ সরলপ্রাণা গ্রাম্য সলজ্জ মহিলা মা সারদা, কিন্তু অন্তরে ছিলেন উদারমনা সংস্কারমুক্ত মহীয়সী গরিমার মাতৃমূর্তি। নারী জাতির কল্যাণে প্রাণরূপে

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মা সারদাকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সেই মাতৃজাতির পুনরুদ্ধারের জন্যই মহীয়সী মা সারদার আবির্ভাব।

ভারতীয় নারীর অবহেলিত জীবনকে শিক্ষার আলো ছাড়া উন্নত করা সম্ভব নয়, সে কথা ঠাকুর স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন। মা সারদামণিকে যেমন এ কাজে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনিভাবেই এই শহরে বসেই 'মেয়েদের শিক্ষাদান' করার কথাই শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁর প্রিয় শিষ্যা গৌরীমাকে বলেছিলেন। গৌরী মা ঠাকুরের সেই নির্দেশ পালন করেন মা সারদার আদর্শ অনুসরণ করে। তারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মা সারদার নামে নামাঙ্কিত 'সারদেশ্বরী আশ্রম'। এই আশ্রম মূলত অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় এবং মঠের সন্ন্যাসিনীদের জন্য। মা বলতেন, 'জীবনটা কেবল 'থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড়' নয়। মেয়েরাও শিক্ষিত হতে পারে, মেয়েরাও সন্ন্যাসী হতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে। মা যে আদর্শের কথা বলেছিলেন তা বৈদিক যুগের নারীরাও দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও মায়ের অনুগামী হয়ে বলেছিলেন—মেয়েরাও পুরুষের মতো শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে সমাজজীবন, জাতিকে দেশকে উন্নতভাবে গড়ে তুলতে পারে। গৌরীমা ছিলেন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ শিষ্যা।

মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবার নির্দেশ দিয়ে কৌতুক ছলে ঠাকুর বলেছিলেন আমি জল ঢালি, তুই কাদা চটকা। সেই নির্দেশকে পাথেয় করে তিনি এক মহৎ কাজে নিজেকে সঁপে দেন। ইংরেজির ১৮৯৫, (বাংলার ১৩০১) ব্যারাকপুরের গঙ্গার তীরে কপালেশ্বর গ্রামে চালাঘরে প্রথম সারদামা'র নামে "শ্রী শ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুর প্রথমে তিনি কয়েকজন কুমারী ও কয়েকজন বিধবাকে নিয়ে গড়ে তোলেন আশ্রম, তাদের শিক্ষা ও আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে। সেই সঙ্গে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আশ্রমের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী তৈরি করা। চারভাগে তাঁর কাজের ধারাকে বিভক্ত করেন — (১) স্ত্রী শিক্ষা প্রচার (২) শিক্ষিকামন্ডলী গঠন (৩) দরিদ্র মেয়েদের ও বিধবাদের সাহায্য (৪) মেয়েদের জীবন ও জীবিকার উপায় সন্ধানে সহযোগিতা।

প্রথমে খুবই ছোট আকারে গোলপাতার চালা, ছাঁচবেড়ার প্রাচীর এবং সামনের মেঝে ছিল। গ্রামের সাধারণ লোকের সহায়তায় শ্রীবৃদ্ধি হয়। আশ্রমের কাজের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে মা সারদার কাছে যেতেন, সঙ্গে মেয়েদেরও নিয়ে যেতেন। এর পেছনে ছিল নিঃস্ব সন্ন্যাসিনী গৌরীমার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নিরলস প্রয়াসে ভিক্ষার দান সংগ্রহ। গৌরীমা উপলব্ধি করেছিলেন, কলকাতার জনমন্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখতে না পারলে তাঁর নারীশিক্ষা এবং আদর্শ নারীগঠনের কাজ প্রসার করা যাবে না। তখন ব্যারাকপুর থেকে শহর কলকাতায় আসা সহজ ছিল না। তাই সেই আশ্রম কলকাতায় প্রথমে গোয়াবাগানে ভাড়াবাড়িতে, ৯/৭৩ শ্যামবাজার স্ট্রিট, ৫৩/১ শ্যামবাজার স্ট্রিট, ৫বি, রাধাকান্ত জিউ স্ট্রিট এবং সর্বশেষ ২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে উঠে আসে। বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের সংস্কৃত এবং উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এর সঙ্গে হাতের কাজও।

আশ্রমের বেশিরভাগ ছাত্রীই আবাসিক। যাঁরা বাইরে থেকে এসে পড়তে চায় বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায় তারাও সম্পর্ক রাখতে পারে। যারা এখানে সন্ন্যাসিনী হিসেবে থেকে যেতে চান, তাদের জীবন যাত্রা কিছুটা স্বতন্ত্র। গৌরীমার উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির কল্যাণসাধনে উৎসর্গকৃত কিছু আদর্শ চরিত্র ব্রহ্মচারিণী গঠন করা—যাঁরা অন্য মেয়েদের তৈরি করতে পারেন। তাদেরই সন্ন্যাস দেওয়া তাদের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'মাতৃসঙ্ঘ' স্থাপন করেন।

পরবর্তীকালে আশ্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্যা পালিতা কন্যা দুর্গাদেবীকে। দুর্গাদেবীকে মাত্র নয় বছর বয়সে পুরীর জগন্নাথদেবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন গৌরীমা স্বয়ং। দুর্গাপুরী মাতা যথাযথভাবে তা পালন করে গেছেন। তাঁর সময়েই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপে এবং বিহার-ঝাড়খন্ডের গিরিডিতে সারদেশ্বরী আশ্রমের শাখা তৈরি হয়। স্থানীয় কাজকর্ম চালনার জন্য একটা কমিটি থাকলেও মূল কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি কলকাতার প্রধান কেন্দ্র। নবদ্বীপে মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রীদের বিদ্যালয়, ছাত্রী আবাস , সন্ন্যাসিনীদের স্থায়ী বাসস্থান আছে। সঙ্গে মন্দির তো আছেই। গিরিডিতে অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। আজ নিঃসম্বল নিঃস্বার্থ বহু সন্ন্যাসিনীরা ব্রহ্মচারীরা সেই দায়িত্ব ঈশ্বরের কাজ হিসেবে ধর্মে কর্মে একীভূত করে।

বর্তমান অধ্যক্ষা বন্দনাপুরী মাতা জানালেন, প্রথম থেকেই সারাদামায়ের যে আদর্শ নিয়ে গৌরীপুরী আশ্রম বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন, তা আজও একই ধারায় চলছে। আশ্রমের শিক্ষা দীক্ষা চালনার জন্য গৌরীমা কোনদিন সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেননি। তাই আজও সরকারি সাহায্যে আশ্রম অনাগ্রহী। ভক্ত ও শিষ্যদের অনুদানে চলে। ছাত্রী সংখ্যা তো কখনই এক থাকতে পারে না। আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে সরাসরি এখানকার মেয়েদের পরীক্ষা দিতে হয়। পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্য মেয়েদের আশ্রম নানাভাবে সাহায্য করতে সচেষ্ট থাকে। এই আশ্রম বিদ্যালয় ভবন আলাদা। সেখানে যাঁরা পড়ান, তাঁরা নিবেদিত প্রাণ মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতা করেন। সেলাই হাতের কাজ ও সঙ্গীত শিক্ষার শিক্ষিকারা বাইরে থেকে এসে শিক্ষা দেন বিনা পারিশ্রমিকে। এমন কি এখান থেকে পাশ করে যে সব মেয়েরা উচ্চশিক্ষালাভ করে স্বপ্রতিষ্ঠিত, তারাও সাগ্রহে এসে পড়িয়ে দেন। আশ্রম পরিচালনার জন্য আছে একটি ট্রাস্ট। ট্রাস্টের সদস্যরা সকলেই মাতৃসঙ্ঘের আশ্রম-বাসিনীরা। বাইরের বিশিষ্ট কয়েকজন মহিলাদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি তৈরি করা হয়। আশ্রম পরিচালনায় পরামর্শ দেবার জন্য একটি অ্যাডভাইসরি কমিটি গঠন করা হয় সমাজের বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে।

সব রকম অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বড় বড় অনুষ্ঠানে আশ্রমের মেয়েরা নাটক-গান-নাচ পরিবেশন করে। এখানে বিশেষত্ব এই যে, শ্রীমা তার নিজস্ব 'মালা' বিশ্বাস করে নিজ প্রিয় শিষ্যা দুর্গাপুরী দেবীকে অর্পণ করেছিলেন। আজও তা বহুমূল্য সম্পদ। এমনকি মাতৃসঙ্ঘের মেয়েদের সন্ন্যাসের সময়ে ওই মালাকে সামনে রেখে দীক্ষা দেওয়া হয়।

সারদেশ্বরী আশ্রম

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। সাতাশ

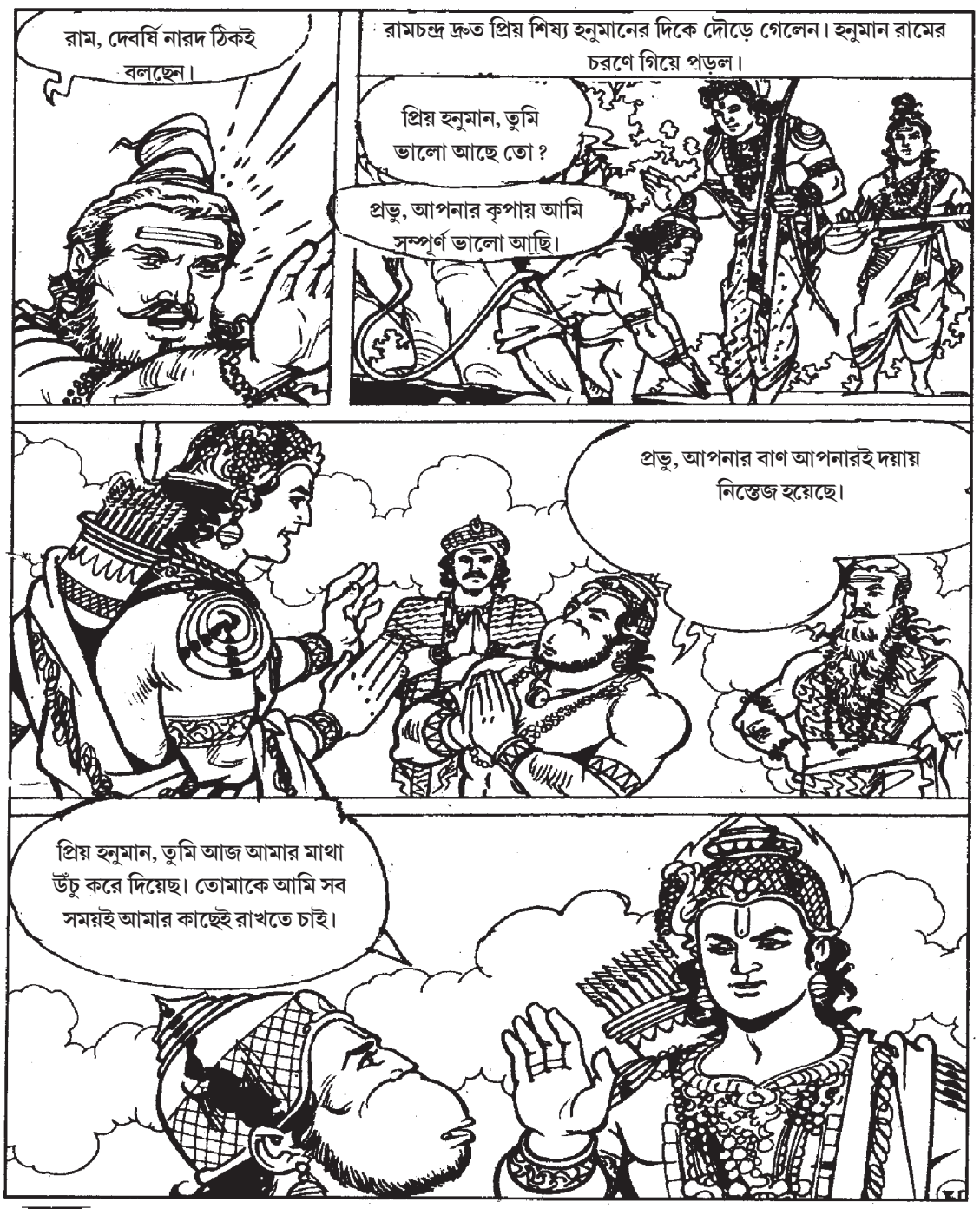

ভক্তের প্রার্থনা

(১১ পাতার পর)

উক্ত পত্র লিখেছেন। কারণ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রভু নীলাদ্রিনাথের আজ্ঞা একান্ত প্রয়োজন।

বেলা সাড়ে দশটায় উক্ত পত্র আমি শ্রীমন্দিরে জগন্নাথদেবের সেবক হরিহর করের হাতে দিই। তিনি পত্রটি বিগ্রহের চরণতলে রাখার কয়েক মুহূর্ত মধ্যে তাঁর (বিগ্রহ) নাকের পুষ্প আভরণ (নথের আকারে) খুলে পড়ে যায় ওই পত্রের ওপর। সারা মন্দির তখন বিস্ময়ে আন্দোলিত। তুমুল কোলাহল সারা গর্ভমন্দির ও জগমোহনে পূজারী পান্ডাদের মধ্যে।

বলাবলি করছেন বিগত ১০০ বছরে নাকি এ ঘটনা ঘটেনি। মহাপ্রভু পত্রের ওপর নিজের অঙ্গাভরণ (যা খুলে পড়া অসম্ভব) নিক্ষেপ করে কি আজ্ঞা দিলেন। সেটা জানলেন দেবানন্দজী, আমি ও বাংলার সাধু সমাজ।

দক্ষিণাচারী জ্যেষ্ঠতাত আর বামাচারী মাতুলদের ফাঁদে রাহুল গান্ধীর অন্তরাত্মা কাঁদে

বিশাখা বিশ্বাস

প্রায় বত্রিশটি বছর ধরে বামবাদী বাংলার লালপন্থী সরকারের রিগিং-সন্ত্রাস-অত্যাচারকে যিনি বাঁচার শ্বাস যোগাবার ঠিকেদারি করে চলেছেন, যার বিরল বুদ্ধি স্বাধীনোত্তর কালের ভারত-সরকারগুলির মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল, প্রতারক ও ঘৃণ্য দিল্লীর সরকারটিকে প্রায় পাঁচটি বছর ধরে অক্সিজেন যোগাবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে, মুম্বাই-কান্ডের পরে অতি সম্প্রতি পাকিস্তানকে রক্ত জোগাবার দালালিতে বঙ্গীয় সেই খর্বাকার ব্রাহ্মণটি মন্তব্য করেছেন "পাকিস্তান সরকারের (অসহায়তার) দিকটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে"। তার আগেই অবশ্য রাজনীতির মাটিতে শেকড়হীন কেবল নেহরু বংশের প্রভুপদসেবী সেই বাঙালি চাণক্যটির টিকিতে টান দিয়ে দিল্লীর সরকারের 'সর্বকালের প্রাণের বান্ধব এবং চিরকালের দুর্দিনের মিত্র' কোনও এক লালপন্থী কেতাবী তাত্ত্বিক বলেই রেখেছিলেন "মুম্বাই-কান্ডের ফল্ আউট যেন কোনও কমিউন্যাল ফর্ম তৈরি না করে (অর্থাৎ পাক-নাশকতা ও মানব হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের মুসলিম প্রাণে যেন কোনও আঘাত না লাগে)।

তোষামুদে সেকুলার রাজনীতির এই খানেই চিরকেলে ট্র্যাজেডি। সেই ট্র্যাজেডিরই উৎসমুখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ-প্রবৃদ্ধ কংগ্রেসী জ্যেষ্ঠতাতগণের গন্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করে কংগ্রেসের বাল-সেনাপতি রাহুল গান্ধী সম্প্রতি বলেছেন, ঘরে ঢুকে পাকিস্তান বারে বারে থাপ্পড় মেরে যাবে আর আমরা সংযমের বাণী বিলোবো — এটা হয় না (খবর-১৩।১২।০৮)। বেচারা রাহুল গান্ধী! তার শরীরে ইন্দিরা-ফিরোজ খা'ন গান্ধীর তাপ আছে, শিরায়-উপশিরায় তারুণ্যের রক্ত প্রবাহে তরঙ্গাঘাতও আছে, কিন্তু কেবল এদেশের কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের সেকুলার রাজনীতির মর্মকথাটি তার মগজে নাই। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কেবল পঁচাশি হাজার কাশ্মীরি হিন্দুকে হত্যা করেছে ইসলামি পাক-জঙ্গিরা। ভারতীয় ত্রিশ হাজার সি আর পি এবং বি এস এফ সহ আর্মি অফিসারদের সেই বিধর্মী জেহাদী হানাদারেরা খুন করেছে। বিদেশী জেহাদী ও দেশী মুসলিমদের অত্যাচারে তিন লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পন্ডিত স্বদেশেই স্বরাজ্য ছাড়া। রাহুল গান্ধীর পারিবারিক কংগ্রেস আর তার লালবান্ধব বরুণ সেনগুপ্ত বর্ণিত 'গরুর গায়ের এঁটুলিরা' সেসব নিয়ে কোনওদিন কোনও কথা বলেনি। কেননা, রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক মাতুল প্রণব মুখার্জীরা মনে করেন "পাকিস্তান সরকারের দিকটাও আমাদের দেখতে হবে"। কেননা, রাহুল গান্ধীদের পার্টির চালিকাশক্তি লালরঙা কেতাবী নেতা সীতারাম ইয়েচুরিরা ভাবেন, আমাদের কোনও "ফল আউটই যেন কমিউন্যাল ফর্ম না পায়" (অস্য মূলার্থ ঃ আমাদের কোনও প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম ভাবাবেগ যেন আহত না হয়)।...

এদেশের কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের ভারত রাজনীতির মর্মকথাটুকু বুঝতে হলে সেই রাজনৈতিক ইতিহাসে রাহুল গান্ধীকে অন্য এক বিয়োগান্তক নাটকের কথা শুনতে হবে। তার পিতামহী ইন্দিরা গান্ধীর আস্থাভাজন কাশ্মীরের রাজ্যপাল জগমোহনজী তাঁর বিরল দক্ষতায় প্রচলিত আইনেই কাশ্মীরের জঙ্গি সন্ত্রাসকে একেবারে মুঠোয় বন্দী করে ফেললে সেরাজ্যের সেকুলার-সংখ্যালঘু সমাজের একাংশ হল্লা জুড়ে দিল, জগমোহনকে সরাতে হবে। তখন সেটা ১৯৮২ সাল। ১৯৮৯ সালে বি জে পি-র বিরোধিতার মুখেও জ্যোতি বসুর চাপে ভি পি সিং-এর সেকুলার বদান্যতায় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীত্ব পেলেন। 'দেশপ্রেমিক' মুসলিম নেতা মুফতি মহম্মদ সঈদ। ভারত রাজনীতির তদানীন্তন চালিকাশক্তি জ্যোতি বসুর ইচ্ছায় আপন পদ হতে অপসারিত হলেন জগমোহনজী এবং সপ্তাহ ফুরোবার আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কন্যা রুবিয়ার ঘটলো অপহরণ। সেই অপহরণ কান্ডের জেহাদী শর্ত মতো জগমোহনজীর সময়ে ধৃত ষোল কুখ্যাত ইসলামী জঙ্গিকে ছেড়ে দেওয়া হলে ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব থেকে হাস্য মুখে বেরিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী-তনয়া রুবিয়া। সেদিনের সেই সাজানো নাটকে কোনও রাইজিং এ্যাকশন ছিল না। ছিল না কোনও নাট্য-ক্লাইম্যাক্স-ও। একেবারে ইনিসিয়েল ইন্সিডেন্টেই সেদিন নেমে এসেছিল পুরোপুরি কাঁচা হাতে রচিত এক হাল্কা নাটকের ক্যাটাস্ট্রফি — যবনিকাপাত। কেমন এমনটি হতে পেরেছিল? কেননা, "পাকিস্তানের দিকটাও তো আমাদের বিবেচনা করতে হবে" (পাকিস্তানের বদমায়েসী নির্মূল হয়ে গেলে মুসলমান নিয়ে আমাদের ভন্ডামিটাও যে নির্মূল যাবে!) কেননা, আমাদের দেখতে হবে, যেন "আমাদের কোনও ফল আউট কমিউন্যাল ফর্ম না পায়"।.....

রাহুল গান্ধীর তারুণ্য আছে। তারুণ্য তাড়িত আবেগ আছে। আবেগ-বিধৌত দেশপ্রেমও হয়তো খানিক আছে, কেবল ইতিহাসের চর্চাটি তার একেবারেই নাই। শেষ করার আগে রাহুল গান্ধীদের জন্যে এখানে রয়েছে তাই ভারত-রাজনীতির আরেক ইতিহাস। সেই ইতিহাসে পবিত্র চারার-এ-শরীফে আশ্রয়প্রাপ্ত জেহাদিরা জঙ্গির গুলিতে শহীদ হল আঠারো জন ভারতীয় প্রতিবাদী নাগরিক এবং একুশজন নিরাপত্তা জওয়ান। না, কোনও হিন্দু মুসলিম ভারতীয় নাগরিকের জীবন রক্ষায় নয়, নয় অপহৃত কারও মুক্তির জন্যে — কেবল পবিত্র চারার-এ-শরীফের পবিত্রতা রক্ষার্থেই চৌদ্দদিন ধরে বিরিয়ানী খাইয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেইসব মুসলিম জঙ্গিদের পালাবার সেফ প্যাসেজ দিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। কেননা, রাহুল গান্ধীর তেরঙা পিতৃব্যরা মনে করেন, "পাকিস্তান সরকারের দিকটাও তো বিবেচনা করতে হবে"।

কেননা, রাহুল গান্ধীর লাল মাতুলেরাও মনে করেন "কোনও ফল আউট-ই যেন কমিউন্যাল ফর্ম না পায়"।...

বেচারা রাহুল গান্ধী! বড় লজ্জায় বহু ব্যথায় সেই বেচারাটিকে তাই বলতেই হয় ঃ পাকিস্তান ঘরে এসে বারে বারে থাপ্পড় মেরে যাবে আর আমরা চুপ করে সংযমের সাধনা করবো — তা হয় না। ইনসাল্লা, ইনসাল্লা।....

> "পাকিস্তানের দিকটাও তো আমাদের বিবেচনা করতে হবে" (পাকিস্তানের বদমায়েসী নির্মূল হয়ে গেলে মুসলমান নিয়ে আমাদের ভন্ডামিটাও যে নির্মূল যাবে!) কেননা, আমাদের দেখতে হবে, যেন "আমাদের কোনও ফল আউট কমিউন্যাল ফর্ম না পায়"।.....

ধর্ম রক্ষা মঞ্চের জন জাগরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সন্ত্রাসবাদ, অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের নরম নীতির বিরুদ্ধে 'জন-জাগরণ' অভিযানে নামতে চলছে হিন্দু সংগঠনগুলি। 'ধর্ম রক্ষা মঞ্চ'-এর নামে এই অভিযান চালানো হবে। ধর্ম রক্ষা মঞ্চের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও থাকছে। মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে এলাহাবাদ শহরে, জানুয়ারির মাঘ মেলায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু-সন্তরা।

এই জনজাগরণ-২০০৯-এর ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের ২০ তারিখ পর্যন্ত চলবে। নেতৃত্ব দেবেন আখড়া পরিষদের কর্ণধার সন্ত জ্ঞানদাস। দেশের প্রতিটি প্রান্তেই অভিযান চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সূচী মকর সক্রান্তির উৎসবের পরেই ঠিক হবে। বিভিন্ন জায়গায় মিছিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হবে। মূলত হিন্দুদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করতেই এই জন জাগরণ অভিযান।

চিকাগোয় ভারতীয় শিল্পের নতুন বিভাগ

সংবাদদাতা।। ভারতীয় শিল্পের জন্য আমেরিকার চিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট-এ দুটি নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। যার একটিতে ভারতীয় শিল্প, অন্য আর একটিতে হিমালয়ের বিভিন্ন শিল্প রীতির নিদর্শন রাখা থাকবে। বহু প্রাচীন চিত্রও এই বিভাগে স্থান পাবে। এতে খুব সহজেই সকলের কাছে ভারতীয় শিল্পের একটা রূপ তুলে ধরা যাবে। সেইসঙ্গে থাকছে সমগ্র এশিয়ার বিভিন্ন শিল্পের নির্দশন।

জার্মানে গণেশমন্দির

সংবাদদাতা ।। জার্মনের বার্লিনে তৈরি হতে চলেছে গণেশ মন্দির। জার্মাণ সরকার মন্দির তৈরির অনুমতিও দিয়েছে। বহু আগেই মন্দিরের আবেদন প্রশাসনের কাছে জমা পড়ে। বার্লিনের হসন হিদে পার্ক-এ তৈরি হবে মন্দিরটি। প্রায় ৮৪ হেক্টর জমির ওপর মন্দির তৈরি হচ্ছে। মন্দিরটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দিরের জায়গা দখল করবে। সঙ্গে থাকছে অনান্য দেব-দেবীর মূর্তি। এর সঙ্গে ধ্যান কক্ষও নির্মিত হবে। মন্দির নির্মাণের সভাপতি বলেছেন, সম্ভবত ২০০৯-র মধ্যে মন্দির তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী চরিত্রে অভিনয়ে নারাজ 'তুলসী'

বি স কে ঃ কলকাতা ।। ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী কোনও চরিত্রেই অভিনয় করতে রাজি নন তুলসী ওরফে স্মৃতি ইরানি। 'কিঁউ কি সাস ভি কভি বহু থি' খ্যাত তুলসীকে কালার প্লাস চ্যানেলের 'বিগ বস' শোয়ে অভিনয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়। তুলসীর মতে 'বিগ বস' ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী। তাই তুলসী সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। তুলসীর সাফ জবাব, বড় বা ছোট কোনও পর্দাতেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী কোনও চরিত্রেই অভিনয় করতে রাজি নন।

পরলোকে প্রেমময়ী দেবী

গত ১৩ ডিসেম্বর বর্ধমানে নিজবাসভবনে প্রেমময়ী দেবী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। তিনি পাঁচ পুত্র, এক কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক দিলীপ দে-র তিনি মাতৃদেবী। গত কয়েকবছর তিনি মায়ের সেবায় রত ছিলেন।

❋ ❋ ❋

দুর্গাপুর নগরের স্বয়ংসেবক মিহির সিংহ রায় গত ২ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ ক্যান্সারে ভুগছিলেন। স্ত্রী সহ তাঁর এক কন্যা বর্তমান।

❋ ❋ ❋

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর মালদা জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু কুমার ঝাঁ-র পিতৃদেব প্রহ্লাদ কুমার ঝাঁ গত ৫ নভেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশো বছর। তিন পুত্র, চার কন্যা ও নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

❋ ❋ ❋

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক সমীর রায়ের পিতা অনন্তলাল রায় গত ৬ ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

❋ ❋ ❋

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম খাতড়া মহকুমার বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষ দত্তের পিতা করালী দত্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্ত্রী সহ তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

❋ ❋ ❋

চলে গেলেন মুর্শিদাবাদ জেলার জিৎপুর গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক জগদবন্ধু পাল। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক আশীষ পালের পিতৃদেব। গত ২ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। স্ত্রী সহ তাঁর তিন পুত্র, চারকন্যা ও নাতি নাতনিরা বর্তমান।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন।

— ব্যবস্থাপক

প্রকাশিত হলো

ছেচল্লিশের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস

নীলগ্রীব সিংহ'র

সরওয়ারের তলোয়ার, ১৭০

রুদ্র প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

বাঙলার মাটিতে ইসলামের উদয় ও বিকাশ, ১৭০

অমৃত শরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড,কলকাতা-১২৬, ফোন-২৫৪২ ৪৩১৯

বলিউডে সন্ত্রাসে সিনেমা

সতীনাথ রায় ।। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সিনেমার প্রেক্ষাপটেরও ব্যাপক রদবদল ঘটেছে। আজকে একে ৪৭-এর যুগে হিন্দী সিনেমার উপজীব্য বিষয় হিসাবে সন্ত্রাসবাদ একটা বড় প্রেক্ষাপট। সন্ত্রাসবাদের ওপর সিনেমার ক্ষেত্রে 'দিল সে' হিন্দী ছবিটি প্রথম আশার আলো দেখায়। এরপরই একগুচ্ছ

হিন্দী সিনেমা নির্মাতা—এই ধরনের সিনেমা তৈরির দিকে নজর দেয়। লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক এই সমস্যার কথা তুলে ধরে, জনসচেতনতা ও বাস্তবের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা। কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের ওপর সিনেমা তৈরি নিয়েও বলিঘরে শুরু হয়েছে জল ঘোলা। প্রশ্ন উঠেছে, স্বজন হারানো মানুষের কান্না কতটা ফুটাতে পারবেন পরিচালকেরা। এছাড়া তারা সন্ত্রাসবাদের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করছেন না তো?

সম্প্রতি মুম্বাই বিস্ফোরণের ওপর তথ্যচিত্র নির্মাণ নিয়ে পরিচালক ও প্রযোজক সংস্থাগুলো ইঁদুর দৌড়ে নেমেছে।

বিভিন্ন রাজ্যের সিনেমাগুলোতেও এখন সন্ত্রাসবাদ উপজীব্য বিষয় হিসাবে উঠে আসছে। নীচে সন্ত্রাসকে উপজীব্য করে গড়ে তোলা সিনেমার একটি তালিকা দেওয়া হল —

রোজা — কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপট।

সরফারোশ — আই এস আই-র ষড়যন্ত্রের ওপর তৈরি।

দিল সে — নর্থ ইস্টের আতঙ্কবাদ।

মাচিস — পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ।

পুকার — মুম্বাই বিস্ফোরণ।

ইয়াহা — এ দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ।

মিশন কাশ্মীর — কাশ্মীরের বিস্ফোরণ ও সন্ত্রাসবাদ।

আশিক বানায়া আপনে — কান্দাহারের বিমান হাইজ্যাক।

১৬ ডিসেম্বর — মুম্বাই বিস্ফোরণ।

জমিন — দেশের সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র।

ব্লাক ফ্রাইডে — প্রায় ১৫ বছরের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ।

কোম্পানী — দাউদের সন্ত্রাস।

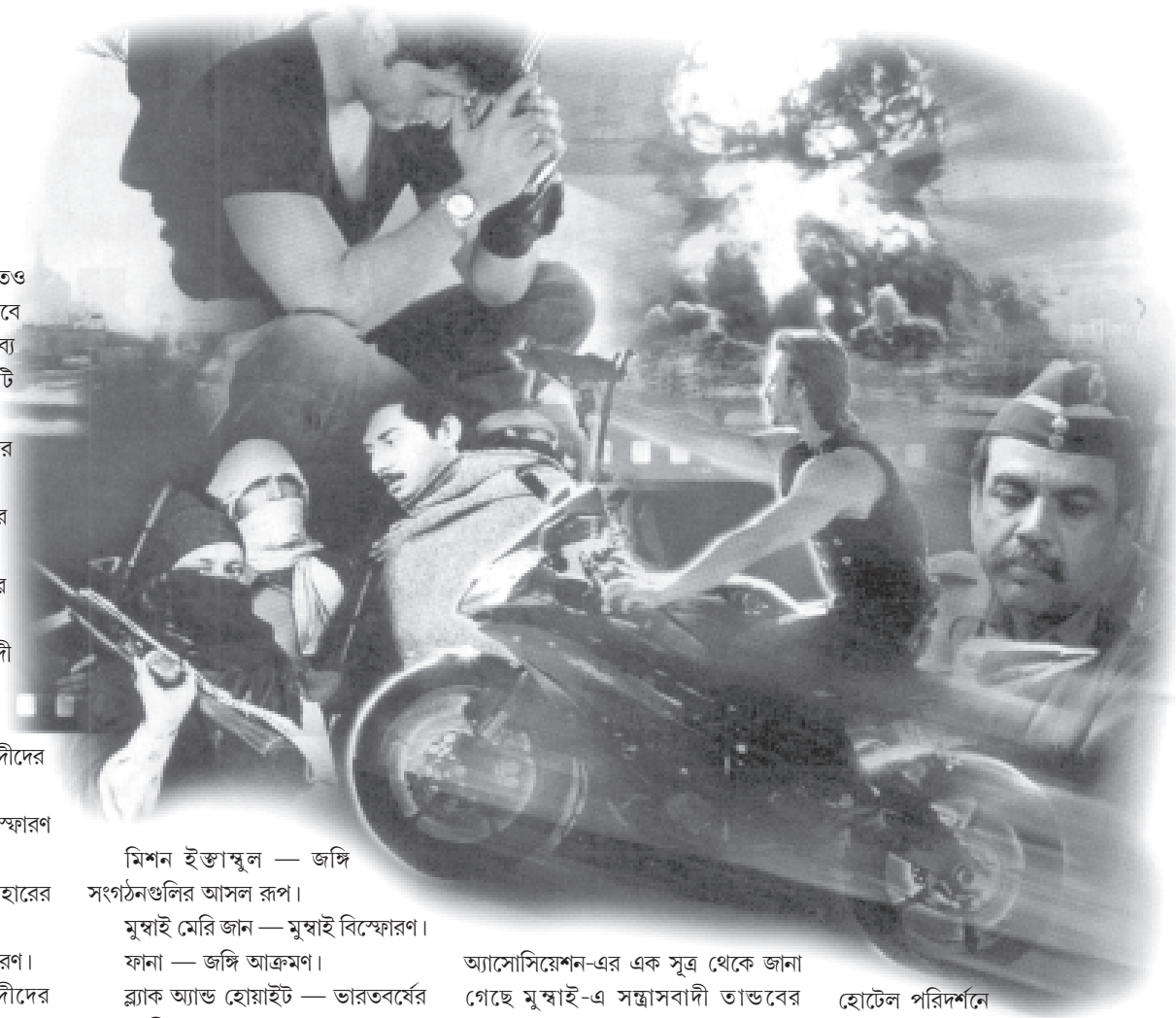

মিশন ইস্তাম্বুল — জঙ্গি সংগঠনগুলির আসল রূপ।

মুম্বাই মেরি জান — মুম্বাই বিস্ফোরণ।

ফানা — জঙ্গি আক্রমণ।

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট — ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদীদের চেহারা।

কাবুল এক্সপ্রেস — তালিবান সংগঠনের চেহারা।

শুট অন সাইট — সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন দিক।

এ ওয়েডনেস ডে — সন্ত্রাসবাদের অভ্যন্তরীণ রূপ।

বোমবাই — বোম্বাই-এর সন্ত্রাসবাদ।

ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রোডুসারস অ্যাসোসিয়েশন-এর এক সূত্র থেকে জানা গেছে মুম্বাই-এ সন্ত্রাসবাদী তান্ডবের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সিনেমা হতে চলেছে। তার জন্য আগাম নাম নথিভুক্ত করার জন্য এখনও পর্যন্ত ১৮টি সিনেমার নাম জমা পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ২৬/১১ অ্যাট মুম্বাই অপারেশন, ২৬ তাজ, তাজ ২৬, তাজ অ্যান্ড ওবেরয়, ৪৮ ঘন্টা অ্যাট তাজ। এই একই ঘটনায় পরিচালক রামগোপল বর্মা মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক তিরস্কৃতও হন। তিনি সদ্য ঘটে যাওয়া মুম্বাই হানার পর তাজ হোটেল পরিদর্শনে যান। উদ্দেশ্য ছিল আহতদের সান্ত্বনা দিতে নয়, সিনেমার রসদ খুঁজতে। প্রশ্ন উঠেছে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়েও। সমাজের একশ্রেণীর দর্শক আজও সন্ত্রাসবাদের ওপর তৈরি সিনেমার ভক্ত। এমনকী মাঝবয়সীদের কাছেও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তৈরি সিনেমাগুলো হিট হচ্ছে। সে হিসাবে সরফারোশ, পুকার, ফানা বেশ জনপ্রিয়। আর এধরনের সিনেমা তৈরি রেওয়াজও যেন ক্রমশ বাড়ছে।

শব্দরূপ - ৪৯১

রূপেন পাল

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. ঘর-দোর এ মাটির বাসা নির্মাণকারী কীট বিশেষ, ৫. ঈঙ্গ শব্দে জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী , ৭. প্রতিশব্দে সমুদ্র, অর্ণব, জলধি, ৯. দেহের বাইরের আবরণ, ১১. পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন ও অল্পবিরতির চিহ্ন, ১৩. দুর্যোধনের মাতুল,

উপর-নীচ ঃ ২. বিশেষণে মোট, থোক, নগদ, মধ্যে শক্তি, আগাগোড়া জলপাত্র, ৩. চণ্ডিকাদেবীর রূপবিশেষ, আগাগোড়া পিতৃব্য, ৪. একই নামে বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, শেষ দুয়ে বাঙালি পদবি বিশেষ, প্রথম ঘরে সৌন্দর্য, ৬. দেশি শব্দে হিমালয় প্রদেশের পার্বত্য জাতিবিশেষ, ৮. জীব উদ্ভিদ প্রভৃতি দেহের রঞ্জক পদার্থ, ১০. কয়েকটি থানার সমষ্টি, জেলা যে প্রশাসনিক অংশে বিভক্ত, ১১. দন্তধাবন, ১২. মর্দন।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৯

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুণ্ডু
কলকাতা-৬

শ	ল্ক	র	■	বা	ণ	ভ	ট্ট
জ্ঞ	■	জ	না	ব	■	■	■
■	প্যা	ন	■	র	স	ভ	ঙ্গ
■	রা	■	■	■	■	ব	■
■	শু	■	■	■	■	লো	■
পা	ট	শা	ক	■	শি	ক	■
■	■	■	ম	য়ূ	খ	■	পা
ম	তি	লা	ল	■	র	মে	শ

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ জানুয়ারি ২০০৮ সংখ্যায়।

তুলির ছোঁয়ায়

দীপেন ভাদুড়ী।। গত ২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর '০৮ বেঙ্গালুরুর 'চিত্রকলা পরিষদ' আর্ট গ্যালারীতে চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়ে গেল। অংশগ্রহণ করলেন ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশনস্-এর শিল্প গোষ্ঠী। হায়দরাবাদ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন দু'জন শিল্পী — চন্দনা খান, যিনি আই এ এস পদে চাকুরীরত এবং মারেদু রামুল। মুম্বাই থেকে দেবযানী দত্ত। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে নাগেশ্বর রাও। কলকাতা থেকে তরুণ চক্রবর্তী, ধীরেন শাসমল, সমীর আইচ, অশোক গাঙ্গুলী, বরুণ সাহা, বিশ্বরূপ গড়াই, সুব্রত শঙ্কর সেন, সুজিত ঘোষসহ মোট বারো জন শিল্পী।

বিভিন্ন আঙ্গিকে আঁকা মোট ৬০টি ছবি ছিল এই প্রদর্শনীতে। বিশেষ এ্যাক্রিলিকে আঁকা ছবি। এ ছাড়াও ছিল মিক্সমিডিয়া। অয়েল পেন্টিং, চারকোলে আঁকা ছবি, বিদগ্ধ জনগণ প্রতিদিন প্রদর্শনী দর্শন করেছেন এবং

শিল্পীদের শিল্পকলা ক্রয় করে প্রশংসা করেন শিল্পীদের শিল্পকে। প্রদর্শনী চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে কর্ণাটক ফাইন আর্ট আকাদেমী''র উচ্চপদস্থ আমলাগণ অংশগ্রহণ করেন।

কলকাতায় ফিরে আসার পর বহু পুস্তকের প্রচ্ছদ এবং পত্র-পত্রিকার অলঙ্করণ সিদ্ধ হস্তে এবং ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশনস''-এর মূল উদ্যোক্তাদের একজন শিল্পী তরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এই প্রতিবেদকের। তরুণ বাবুর কাছ থেকে জানা যায় যে তিনি বিভিন্ন সমাজ ভাবনার উপর বেশির ভাগ ছবি আঁকেন। সমাজ তাঁকে ভাবায়। সমাজের অধঃপতনে ব্যথা দেয়। সমাজ তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাঁর ছবিতে এর প্রতিফলন প্রতি মুহূর্তে দেখা যায়। শিল্পরসিকগণও সেজন্য তাঁর ছবি প্রশংসা করেন।

কার্গিল-এর উপর আঁকা তাঁর ছবি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৬ ফুট। বিশ্বভারতীর কপিরাইট আইন থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি উপলক্ষে অর্জন করে তাঁর একাধিক ছবি দুর্গা, গণেশ, বাউল, বুদ্ধ দেব অবলম্বনে অঙ্কিত হয়েছে এবং শিল্পী এ ধরনের বৈচিত্র্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। গণেশের উপর আঁকা শিল্পীর দুখানি ছবি ছিল বেঙ্গালুরুর প্রদর্শনীতে। ''ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন''-এর শিল্পী গোষ্ঠীর বর্তমানে প্রদর্শনী চলছে মুম্বাই-এর ''আর্ট দেশ স্টুডিও'' আর্ট গ্যালারীতে ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর ০৮। সেখানে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা নতুন নতুন ছবি নিয়ে মুম্বাই-এর প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিকের ছবি ব্যতীত আরও বেশ কিছু ছোট ছোট আঁকা ছবি এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা ওই প্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা অপেক্ষায় রইলাম কলকাতায় এই গোষ্ঠীর প্রদর্শনী দেখার জন্য।

Ganesh Raut (B.Com)
***Govt. Authorised Agent* L.I.C.I.**
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

চিন্তাবিদ **''শিবপ্রসাদ রায়ের''** অসাধারণ লেখনীর সুলভ সংস্করণ।
প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ (৯৪৩৩০৩৭৭০৫)
প্রাপ্তিস্থান **তুহিনা প্রকাশনী** ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
95% **দশম, একাদশ, দ্বাদশ ২০০৮-০৯ সালের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর**
বিঃ দ্রঃ— শারদীয়া উৎসবের স্টলের জন্য ও গীতা প্রেসের ধর্মীয়

জলদস্যু দমন

বিশ্ব যা পারেনি ভারত তা করে দেখাল

অয়ন প্রামাণিক

একের পর এক আক্রমণ আর দস্যুতার বিরুদ্ধে এক রুদ্ধশ্বাস জয়লাভ। নয় নয় করে ২০০৯-এর প্রাক্কালে এডেন উপসাগরে জলদস্যুদের ওপর পর পর দু'বার জোরালো আঘাত করল ভারতীয় নৌসেনা। এবারে ঢাল তলোয়ার নিয়ে নেমেছিল আই এন এস মাইশোর, প্রথম আঘাতেই জলদস্যুদের এক ইথিওপিয়ান বাণিজ্যিক জাহাজ হাইজ্যাকের প্ল্যানকে বানচাল করে দেয়। টান টান উত্তেজনায় ভরা 'মাইশোর'-এর যুদ্ধ টা শুরু হয় ভারতীয় সময়ে শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১১টায়।

ছ'হাজার ন'শো টনের দিল্লীর এই মিসাইল ডেসট্রয়ার জাহাজ এম এম বি চ্যানেল ষোলোর (নৌ জাহাজের একটি যোগাযোগ মাধ্যম) তার দিয়ে ইথিওপিয়ান সেই জাহাজ জিবে থেকে এক 'আপদকালীন বার্তা' আসে। তারপর সে এক কঠিন যুদ্ধ। 'চেতক' (হেলিকপ্টার) নেমে যায় চারজন নৌসেনা নিয়ে জলদস্যুদের দুরমুশ করতে।

'প্রথম দিকে 'জিবে'র সেনারা ছোটোখাটো গুলির লড়াই চালাচ্ছিল দস্যুদের সাথে। তারপর মাথার উপর চেতকের দৌরাত্ম্য দেখে দস্যুরা তাদের গুলি থামাতে বাধ্য হয়' বলে যুদ্ধরত এক সেনা অফিসারের বক্তব্য। ততক্ষণে সেই রণতুর্যা মাইশোরের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে ২৩ জন দস্যু একসাথে কোনওরকমে ১০ মিটার দৈর্ঘ্যের 'সালাউদ্দিন' নৌকায় জড়ো হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ঠিক সেইসময় মাইশোর তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ শুরু করে দেয়। ওদিকে কমান্ডোরা খুব নিপুণভাবে কৌশলের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দস্যুদের সেই নৌকাকে ঘিরে ফেলেন। কমান্ডোদের দেখে দস্যুরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যদিও প্রথমদিকে ধরা পড়ে এরা নিজেদের সাধারণ জেলে বলে দাবি করে। ১২ জন সোমালীয়, ১১ জন ইয়েমেনী সহ সাতটা ট্রন-৪৭ ও রকেট প্রপেলড্ গ্রেনেড ও প্রচুর গোলাগুলি ধরা পড়েছে।

এতো গেল 'মাইশোর'-এর অভিযান। নভেম্বরের ১১-তে আই এন এস তেবর দেখিয়েছিল টানা নববই মিনিটের আর এক

ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ আই এন এস 'তেবর'।

ইঁদুর-বিড়াল খেলা। 'তেবার' ছুড়ছে ত্রিশ মিলিমিটারের ছ'মুখি স্বয়ংক্রিয় বন্দুক থেকে এলোপাথাড়ি গুলি, রকেট প্রোপেলড্ গ্রেনেড থেকে গোলা, সাথে জলদস্যুদের ঘন ঘন হুঙ্কার আর গোলাবর্ষণ। বেশ কিছুক্ষণ চলল সেই তুমুল লড়াই। শেষমেষ Pirate দের নৌকাডুবি আর দুটো নৌকা সমেত দস্যুরা পালিয়ে বাঁচল। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের কুড়িটা যুদ্ধ জাহাজের দিবারাত্র প্রহরা সত্ত্বেও কিন্তু ভারতের শক্তিশালী নৌ-সেনাই এডেন উপসাগরের দস্যুদের প্রথম আঘাতটা করে দেখাল।

আরবসাগর থেকে রেড সাগরের দিকে ৪৯° (প্রায়) অক্ষাংশে দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সোমালিয়া। অন্যতম কুখ্যাত জলদস্যুতার জন্য;ইয়েমেন ও সোমালিয়ার মাঝামাঝি এডেন উপসাগরে ২০০৮-এর জানুয়ারি থেকে প্রায় ১০০টা জাহাজকে দস্যুরা আক্রমণ করেছে। তার মধ্যে ৩৩টাকে হাইজ্যাক করতে পেরেছে এখনও। অন্যদিকে 'তেবর' ভারতীয় জাহাজ MV Jag Arnav ও সৌদীর NCC Tihama হাইজ্যাকের পরিকল্পনাও বানচাল করে। ১৪ টা তাদের হেফাজতে আছে। এ যাবৎ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ Pirate রা আক্রমণ শুরু করে। তারপর ঘটনাবলী কিছুটা এরকম (সারণী দ্রষ্টব্য)।

এখন বুদ্ধি জীবী থেকে প্রতিরক্ষা মহলের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন, এই সমস্যা গোটা বিশ্বের অর্থনীতির কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ভারতের এই মিশনে অগ্রদূতের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। এমনকী সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, তাদের ক্ষমতায় দস্যুদমন কুলোচ্ছে না। ভারত যেন এগিয়ে আসে।

''আমি কখনও ভাবিনি তিন জন মেয়েকে বিয়ে করব, কিন্তু আমি এখনই সেই স্বপ্ন দেখছি কারণ, আমি যত টাকা চাইছি ততই পাচ্ছি''... নতুন প্রজন্মের অন্যতম জলদস্যু বাইল ওয়াদানি একথা বলেছে। সে আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তিনটের বেশি বিয়ে সে করবে না। সোমালিয়ার ভিতরের জলদস্যু জীবনযাত্রা এইভাবেই এগিয়ে চলেছে। ২০০৮-এ আনুমানিক ৩০ মিলিয়ন ডলার ওরা আয় করেছে। দিনের পর দিন ওয়াদানিদের জীবন বদলে যাচ্ছে। টাকার উপর টাকা জমছে। আর শিল্প গড়ে উঠছে। বন্দী করা নাবিকদের থাকা খাওয়ার জন্য রেস্টুরেন্ট হোটেল নিয়ে ব্যবসা, গ্লামার ফেরাচ্ছে Pirate-দের।

হ্যাঁ, এই গল্পের আর এক মোড় হল— সোমালিয়া ছাড়া বাকী অংশ দারিদ্র্য ও বৈদেশিক আক্রমণ তাদের ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে। রাজধানী মোগাডিসু প্রায় ধ্বংসের আগের অবস্থায়। অন্যদিকে ফতিমা (স্থানীয় তরুণী) বলছে, সোমালিয়ার লোকজন নাকি Pirate-দের সাফল্য কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, আর Pirate-দের কাজে উৎসাহ জানাতে তাদের যাত্রা শুরুর আগে ছাগলের গলা কেটে নিবেদন করা হয়। জলদস্যুদের এই দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদের জন্য অবশ্য সোমালিয়া সরকারের কোনও ক্ষমতাই নেই, এ কথা প্রধানমন্ত্রী হাসান হুসেন স্পষ্টই স্বীকার করেছেন।

জলদস্যুদের কথা আবার অন্যরকম। তারা নাকি মৎস্যজীবী পরিবারের শিকড়-বাকড়; ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য ব্যবসা শিল্প করতে আসার জন্য তাদের জীবনযাত্রা নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি বিদেশী মৎস্যশিল্প ও সোমালিয়ার জেলেদের স্বার্থ দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বই এই দস্যুতার উত্থান ঘটায়। আজ ওদের হাতে AK-৪৭, গ্রেনেড। ওরা নিজেদের সাথে আল-কায়েদার সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছে। তবে কূটনৈতিক মহল কিন্তু আল-কায়েদা যোগ-সাজসের কথাই ভাবছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গোয়েন্দারা অবশ্য দাবি করছেন, সিয়াদ বেয়ার সরকারের ১৯৯১ সালে অপসারণের পর থেকে সোমালিয়া নাকি free for all। ওয়াদানিরা জোরগলায় বলছে, আমরা এই আক্রমণ চালিয়ে যাব।

দস্যুতার ভবিষ্যত মোড় যেদিকেই হোক না কেন, বিশ্বের কাছে বার্তা এই যে ভারতই কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা পরিয়ে ছাড়লো। আশা করাই যায়, ওবামা'র চোখের আড়ালে কিছুই হচ্ছে না!

☞ সেপ্টেম্বর ১৫ ঃ এম টি স্টলট্ ভ্যালরকে হাইজ্যাক করল সোমালীয় জলদস্যুরা।

☞ সেপ্টেম্বর ১৯ ঃ জলদস্যুরা প্রথম দাবি ঘোষণা করল ৬ মিলিয়ন ডলারের।

☞ অক্টোবর ১৫ ঃ জলদস্যুরা ৪৮ ঘন্টা সময় দিল ২.৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার জন্য।

☞ অক্টোবর ১৮ ঃ Pirate দের হুশিয়ারির সময়সীমা শেষ, অথচ জাহাজ বিপদমুক্ত।

☞ নভেম্বর ১৬ ঃ এম টি স্টলট্ ভ্যালর (মুম্বাইগামী)-এর জাপানী মালিকরা মুক্তিপণ দিল।

☞ নভেম্বর ১৮ ঃ আই এন এস 'তেবর' প্রথম Pirate দমন করে দেখাল।

☞ নভেম্বর ২০ ঃ আন্তর্জাতিক জলদস্যু বিরোধী Co-ordination গঠনের দাবী।

☞ ডিসেম্বর ১৩ ঃ আই এন এস 'মাইশোর' ২৩ জন জলদস্যু সমেত একটি নৌকার ওপর আক্রমণ চালিয়ে ইথিওপিয়ার এক বাণিজ্যিক জাহাজকে উদ্ধার করে।

মহাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র

(৯ পাতার পর)

মাধ্যমে গ্রন্থিমোচন না ঘটলে নিত্যজ্ঞান বা নিত্যানন্দে উপস্থিত হওয়া যায় না। বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্র রোমান্টিক Satirist এমন মার্জিত, তীক্ষ্ণ। ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা প্রাচীন কেন, বর্তমান সাহিত্যেও বিরল।

আজ বাংলাভাষার পূর্বধ্বনি পাই ভারতচন্দ্রে। রাজসভায় বসে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিও তিনি গুপ্তশ্লেষ বর্ষণ করেছেন। আবার তিনি বৈষ্ণব কবিদের ভাবজীবনের উত্তরাধিকারী। সুন্দর সিঁদকাঠি দিয়ে বিদ্যার হৃদয় দ্বারে প্রবেশ করেছে রন্ধ্র পথে রহস্যের অন্ধকারে। রহস্যই প্রেমের প্রাণ, রোমান্টিক ধর্মের লক্ষ্মণ। সুন্দর কবি, চোর দুটিই, প্রমাণ করেছে চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হীরা মালিনী, জীবন্ত নারী চরিত্র। অন্নদামঙ্গল রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীঃ। প্রথমখন্ড অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দমঙ্গল।

ভারতচন্দ্র এখানে ব্যক্তিসর্বস্ব মানবিকতা, (Individuality ও humanity) প্রবল, যা নবযুগের লক্ষণ। তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি। আদ্য যমকের উদাহরণ তাঁর কাব্যে 'ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।' অতিশয়োক্তি অলঙ্কার —

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।।

বাঙালির নিত্য ব্যবহার্য বাণী হয়ে উঠেছে অনেক স্বর্ণোজ্জ্বল পংক্তি, যথা— ১। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ২। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ৩। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। ৪। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।। বিরোধাভাস অলঙ্কার।

অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।

ভারতচন্দ্রে মঙ্গলকাব্যের মতো গীতিকবিতার সূত্রপাত। এর ধর্মীয় আবেদনের চেয়ে মানবিক আবেদন প্রধান। 'অন্নদামঙ্গল' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'রাজ সভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদা-মঙ্গল গান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত। যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য।

'একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে পার্শি-পড়া স্মিত পরিহাস পটু বৈদগ্ধের আভাস পাওয়া যায়।

(কালান্তর ২০৯ পৃঃ। রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ খন্ড)।

অন্নদামঙ্গল অনেক গান যুগপৎ তাল ও রাগ সমন্বিত, অধিকাংশ তাল দ্রুত অর্থাৎ ঠুংরি জাতীয়।

নতুন মঙ্গল আসে ভারত সরসভাসে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

নতুন মহল অর্থাৎ নবরসতর, রস রসিকতাপূর্ণ, নতুন কাব্যরসমন্ডিত। সমকালীন জনজীবন ও জীবনরুচি বিধৃত। নতুন গতি ও নতুন প্রাণসঞ্চার। প্রচলিত রীতিকে ভেঙ্গে চুরমার। মঙ্গলকাব্যের নতুন প্রতিমা তাই' অন্নদামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রের অশ্লীল বলে অভিযুক্ত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের নিজের প্রেসে মুদ্রিত প্রথম বইটি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। রাজা রামমোহন ভারতচন্দ্রের লেখা ও কৃতিত্বকে সমীহ ও মনীষীসুলভ দ্বেষ করতেন।

হিন্দী, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, দেশী যাবনী মিশাল ভাষা ব্যবহার করে ভারতচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর অবয়ব।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় গভীরতম ব্যঞ্জনা ভারতচন্দ্রের মতো ভাষা শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। যথা শিবের দক্ষযজ্ঞ —

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লফলফঅট্ট অট্ট হাসিছে।।
প্রেতভাগ সামুরাগ ঝম্পকল্প কাঁপিছে।
ঘোর রোল গন্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে।।

যাবনী মিশাল ভাষা —

মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে, কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজির কুদরত মহিম হইল ফতে ঃ
কেবল তোমার কেরামত।।

হীরা মালিনীর বর্ণনা ঃ

সূর্যময় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী।
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ি।
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
ফুলের চুপড়ি কাঁধে ফিরে বাড়ি বাড়ি।।
দাঁত ছোলা মাজা-দোলা হাস্য অবিরাম।
আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বয়েসে।
গালভরা গুয়াপান পাকিমালা গলে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।

সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের স্ত্রীর নাম ছিল রাধা। পুত্র তিনজন।

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখেছেন :

তুমি বঙ্গ কবি কুঞ্জ রঞ্জন হে।
কত মধুর তোমার গুঞ্জন হে।।
বাঙালীর কবি বাঙালিটি খাঁটি
রায় গুণাকর মাজুগাঁয় বাটি।''

মধুসূদন দত্ত লেখেন —

''যতনে রাখিবে বন্দ মনের ভান্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মন্ডলে।''

ভারতচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে উপন্যাস 'অমাবস্যার গান' লিখেছেন সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পেঁড়ো গ্রাম (হাওড়ায়) এখনও হয়ে চলেছে ভারতচন্দ্র স্মরণে — ভারতচন্দ্র মেলা, প্রকাশিত হচ্ছে স্মারকগ্রন্থ ও পত্রিকা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্মারক স্তম্ভ।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরনো বই, বৈশাখ ১৩৬৪। পৃঃ ৪৮-৬০

৫। ভারতচন্দ্র রচনাবলী — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইত্যাদি।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য। **e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com,** দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫

RNI No.5257/57
29 December - 2008, Rs. 4.00 only
27/1B, Bidhan Sarani, Kol.-6, Ph. 2241-0603

Swastika
Bengali News Weekly

Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

2009

১৪১৫ JANUARY পৌষ-মাঘ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
8th Muharram	23rd Netaji Birthday	26th Republic day	31st Saraswati puja	1 ১৬ পৌষ	2 ১৭	3 ১৮
4 ১৯	5 ২০	6 ২১	একাদশী ২২	8 মহরম	9 ২৪	10 ২৫
পূর্ণিমা ২৬	12 ২৭	13 ২৮	14 পৌষসংক্রান্তি	15 ১ মাঘ	16 ২	17
18 ৪	19 ৫	20 ৬	একাদশী ৭	22 ৮	23 নেতাজী জন্মদিন	24 ১০
25 ১১	অমাবস্যা	27 ১৩	28 ১৪	29 ১৫	30 গণেশ পূজা	31 সরস্বতী পূজা

১৪১৫ FEBRUARY মাঘ-ফাল্গুন

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 ১৮ মাঘ	2 ১৯	3 ২০	4 ২১	5 ২২	একাদশী ২৩	7 ২৪
8 ২৫	পূর্ণিমা ২৬	10 ২৭	11 ২৮	12 ২৯	13 ১ ফাল্গুন	14 ২
15 ৩	16 ৪	17 ৫	18 ৬	19 ৭	একাদশী ৮	21 ৯
22 ১০	23 শিবরাত্রি	অমাবস্যা ১২	25	26 ১৪	27	28 ১৬
*	*	*	*	*	*	*

ফাল্গুন-চৈত্র MARCH ১৪১৫

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 ১৭ ফাল্গুন	2 ১৮	3 ১৯	4 ২০	5 ২১	6 ২২	একাদশী ২৩
8 ২৪	9 ২৫	10	পূর্ণিমা দোলযাত্রা	12 ২৮	13 ২৯	14 ৩০
15 ১ চৈত্র	16 ২	17 ৩	18 ৪	19 ৫	20 ৬	21 ৭
একাদশী ৮	23 ৯	24 ১০	25 ১১	অমাবস্যা ১২	27 ১৩	28 ১৪
29 ১৫	30 ১৬	31 ১৭			10th Fateha Doaz Dahum	11th Dol Jatra

১৪১৫-১৬ APRIL চৈত্র-বৈশাখ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1st Yearly Bank A/c	10th Good Friday	15th Bengali New Years	1	2 বাসন্তী পূজা	3 অন্নপূর্ণা পূজা	4 ২১ চৈত্র
একাদশী ২২	6 ২৩	7 মহাবীর জয়ন্তী	8 ২৫	পূর্ণিমা ২৬	10 গুডফ্রাইডে	11 ২৮
12 ২৯	13 নীলপূজা	14 চড়ক পূজা	15 শুভ নববর্ষ	16 ২ বৈশাখ	17 ৩	18 ৪
19 ৫	20 ৬	একাদশী ৭	22 ৮	23 ৯	24 ১০	অমাবস্যা ১১
26 ১২	27 অক্ষয় তৃতীয়া	28 ১৪	29 ১৫	30 ১৬		

১৪১৬ MAY বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31 ১৬			1st May Day		1 মে দিবস	2 ১৮ বৈশাখ
3 ১৯	4 ২০	একাদশী ২১	6 ২২	7 ২৩	8 ২৪	পূর্ণিমা বুদ্ধপূর্ণিমা
10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯	14 ৩০	15 ৩১	16 ১ জ্যৈষ্ঠ
17 ২	18 ৩	19 ৪	একাদশী ৫	21 ৬	22 ৭	23 ৮
অমাবস্যা ৯	25 ১০	26 ১১	27 ১২	28 ১৩	29 জামাই ষষ্ঠী	30 ১৫

যুগাব্দ : ৫১১০-১১ আচার্য শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু - সার্ধশত জয়ন্তীবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বঙ্গাব্দ : ১৪১৫-১৬

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় JUNE ১৪১৬

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1 ১৭ জ্যৈষ্ঠ	2 দশহরা	একাদশী	4 ২০	5 ২১	6 ২২
পূর্ণিমা স্নানযাত্রা	8 ২৪	9 ২৫	10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯
14 ৩০	15 ৩১	16 ১ আষাঢ়	17 ২	18 ৩	একাদশী ৪	20 ৫
21 ৬	অমাবস্যা ৭	23 ৮	24 রথযাত্রা	25 ১০	26 ১১	27
28 ১৩	29 ১৪	30				

১৪১৬ JULY আষাঢ়-শ্রাবণ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1 ১৬ আষাঢ়	2 উল্টোরথ	একাদশী ১৮	4 ১৯
5 ২০	6 ২১	পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা	8 ২৩	9 ২৪	10 ২৫	11 ২৬
12 ২৭	13 ২৮	14 ২৯	15 ৩০	16 ৩১	17 ৩২	একাদশী ১ শ্রাবণ
19 ২	20 ৩	21	অমাবস্যা ৫	23 ৬	24 ৭	25 ৮
26 ৯	27 ১০	28 ১১	29 ১২	30 ১৩	31 ঝুলনযাত্রা	

১৪১৬ AUGUST শ্রাবণ-ভাদ্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30 ১৩	একাদশী ১৪		13th Janmastami	15th Independence Day		একাদশী ১৫ শ্রাবণ
2 ১৬	3 ১৭	4 ১৮	পূর্ণিমা রাখীপূর্ণিমা	6 ২০	7	8 ২২
9 ২৩	10 ২৪	11 ২৫	12 ২৬	13 জন্মাষ্টমী	14 ২৮	15 স্বাধীনতা দিবস
একাদশী ৩০	17 ৩১	18 ১ ভাদ্র	19 ২	অমাবস্যা ৩	21 ৪	22 ৫
23 ৬	24	25 ৮	26 ৯	27 ১০	28 ১১	29 ১২

ভাদ্র-আশ্বিন SEPTEMBER ১৪১৬

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
18th Mahalaya	21st Id-ul-fiter	1 ১৫ ভাদ্র	2 ১৬	3 ১৭	পূর্ণিমা ১৮	5 শিক্ষক দিবস
6 ২০	7 ২১	8 ২২	9 ২৩	10 ২৪	11 ২৫	12 ২৬
13 ২৭	14 ২৮	একাদশী ২৯	16 ৩০	17 বিশ্বকর্মা পূজা	অমাবস্যা মহালয়া	19 ২ আশ্বিন
20 ৩	21 ইদুলফিতর	22 ৫	23 ৬	24 ৭	25 মহাসপ্তমী	26 মহাষ্টমী
27 মহানবমী	28 বিজয়াদশমী	29 ১২	একাদশী		25th to 28th DurgaPuja	30th Half Yearly Bank A/c

১৪১৬ OCTOBER আশ্বিন-কার্তিক

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
2nd Gandhi Birthday	3rd Laxmi Puja	17th Kali Puja		1 ১৪ আশ্বিন	2 গান্ধীজয়ন্তী	3 লক্ষ্মীপূজা
পূর্ণিমা ১৭	5 ১৮	6 ১৯	7 ২০	8 ২১	9 ২২	10 ২৩
11 ২৪	12 ২৫	13 ২৬	একাদশী ২৭	15 ২৮	16 ২৯	17 শ্যামাপূজা
অমাবস্যা ৩১	19 ভাতৃদ্বিতীয়া	20 ২ কার্তিক	21 ৩	22 ৪	23 ৫	24 ছটপূজা
25 ৭	26 ৮	27 জগদ্ধাত্রী পূজা	28 ১০	একাদশী ১১	30 ১২	31 ১৩

১৪১৬ NOVEMBER কার্তিক-অগ্রঃ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 ১৪ কার্তিক	পূর্ণিমা	3 ১৬	4 ১৭	5 ১৮	6 ১৯	7 ২০
8 ২১	9 ২২	10 ২৩	11 ২৪	একাদশী ২৫	13 ২৬	14 শিশুদিবস
15 ২৮	অমাবস্যা কার্তিক পূজা	17 ১ অগ্রহায়ণ	18 ২	19 ৩	20 ৪	21 ৫
22 ৬	23 ৭	24 ৮	25 ৯	26 ১০	27 ১১	একাদশী ঈদুজ্জোহা
29 ১৩	30 ১৪		2nd Guru Nanak Birthday	28th Id-uz-zoha		

অগ্রঃ-পৌষ DECEMBER ১৪১৬

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1 ১৫ অগ্রহায়ণ	পূর্ণিমা ১৬	3 ১৭	4 ১৮	5 ১৯
6 ২০	7 ২১	8	9 ২৩	10 ২৪	11 ২৫	একাদশী ২৬
13 ২৭	14 ২৮	15 ২৯	অমাবস্যা ৩০	17 ১ পৌষ	18 ২	19 ৩
20 ৪	21 ৫	22 ৬	23 ৭	24 ৮	25 বড়দিন	26 ১০
27 ১১	একাদশী মহরম	29 ১৩	30 ১৪	পূর্ণিমা ১৫	25th Christmas Day	28th Muharram

সৌজন্যে সোমক ব্যানার্জী যোগাযোগ : ৯৮৩০৪১১৬৩৫
যে কোনও LIC পলিসি এবং শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন